ভগবান রমণ মহর্ষি

* হরেন্দ্র নাথ মজুমদার *

বেঙ্গল পাবলিশার্স

ভূমিকা

শ্রীভগবানের নির্ব্যক্তিক চিন্ময় সত্তার পরিচয় প্রদান আমার সাধ্যাতীত। মন ও বুদ্ধির ঊর্ধে জ্ঞানের রাজ্যে পৌছিতে না পারলে তাঁর পরিমাপ সম্ভব নয়—তাঁকে বুঝতে যে সাধনা ও শক্তির প্রয়োজন—তাঁর জীবনবেদ অধ্যয়নে যে অধ্যাত্ম অগ্রগতি আবশ্যক তার কোন কিছুই আমার নেই—এতৎসত্ত্বেও গ্রহণক্ষমতানুযায়ী নিজ অন্তরে শ্রীভগবানকে যতটুকু জেনেছি, তাঁর কায়িক সান্নিধ্যে পৌছিতে না পারলেও তাঁর আত্মিক উপস্থিতি যতটুকু হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ভিতরেই প্রয়াস পেয়েছি—তাঁর কথা, তাঁর উপদেশ, তাঁর অনুপ্রেরণা—সবার সামনে তুলে ধরতে—আর তাও বা যতটুকু পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে তাঁরই আশীর্বাদে—তিনিই জুগিয়েছেন ভাব ও ভাষা।

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষিকে যখন জেনেছি তখন আর তিনি ইহজগতে নেই—সেই সময় হতেই দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছি হৃদয়ে – প্রবল ইচ্ছা জেগেছে মনে অরুণাচলের পুণ্যভূমি মহর্ষির লীলাক্ষেত্র শ্রীরমণ আশ্রম পরিদর্শনের, সুযোগও আসে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে। আপাত দৃষ্টিতে শ্রীরমণাশ্রম দেখে মনে হয় সব ঠিকই আছে—কেবল নেই তার অধিষ্ঠাতা দেবতা। কিন্তু এযে আমার কত বড় ভূল ধারণা তার বোধ আসে যখন আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানাই শ্রীভগবানের সমাধিস্থানে—মাত্র কয়েক মুহূর্ত! দেখি আমার স্বরূপ—অনুভূতি আসে আমি দেহ নই—স্পষ্ট অনুভব করি—শ্রীভগবান আছেন—তিনি চিরন্তন; মনে পড়ে তাঁর কথা—"কোথায় আর যাব আমি?—আমি এখানেই আছি—আমি শাশ্বত।"

হরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৭ রাম মোহন রায় রোড,
কলিকাতা-৯

সূচী

প্রভাত

মাদুরায় পিতৃব্য সুব্বায়ের গৃহের দ্বিতল কক্ষে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ষোল বছরের এক কিশোর আনমনে বসে আছেন, হঠাৎ মৃত্যুভয় তার সমস্ত মন ও সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে— কোন রোগ নেই শরীরে, গ্লানিও নেই কোন প্রকারের তবু মনে হয় মৃত্যু শিয়রে। কিশোর দিশাহারা হয় কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করে না, আত্মীয় স্বজন বা চিকিৎসকের কথাও মনে আসে না, মনে তার স্বতস্ফূর্ত ধারণা আসে—এ বিষয়ের সমাধান তাকে নিজেকেই করতে হবে।

কিশোরের চিন্তা অন্তর্মুখী হয়—মৃত্যু শিয়রে কিন্তু মরণ কি? কে মরবে? মৃত্যু কি শুধু দেহেরই? সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার বাস্তব রূপ দেয় কিশোর। হাত পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, মৃতের ন্যায় দেহ শক্ত হয়ে ওঠে, নিশ্বাস বন্ধ হয়, মুখ বুজে থাকে। অন্তর্মুখীন চিন্তা বলে দেহ মৃত, দেহ শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে ছাই হবে কিন্তু এই দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি **আমিও** মরব? দেহই কি **আমি**? দেহ তো নিষ্পন্দ অসাড় কিন্তু নিজ সত্তার তো পরিপূর্ণ উপলব্ধি হয়, অন্তরে **আমি** এই স্বরও তো অনুভূত হয়। **আমি** দেহ নই **আমি** আত্মা, দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই—অর্থাৎ **আমি** দেহাতীত বিনাশহীন আত্মা এই অনুভূতি জীবন্ত সত্য হয়ে ওঠে কিশোরের হৃদয়ে। সত্যইতো **আমি** বা **আত্মাই** ধ্রুব, সংসারে একমাত্র সার বস্তু, অন্য সবই অসার এই ধারণা বদ্ধমূল হয় তার মনে, সেই মুহূর্ত হতে **আমি** বা **আত্মায়** নিবদ্ধ হয় তার সামগ্রিক চেতনা।

এই কিশোরই বর্ত্তমান যুগের মহামানব ভগবান রমণ মহর্ষি। সংসারাশ্রমে তাঁর নাম ছিল বেঙ্কটরমণ। বার বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা সুন্দরমের মৃত্যু হয়। সুন্দরম্ ছিলেন দক্ষিণ

ভারতের ছোট্ট তিরুচাজী সহরের অল্প লেখাপড়া জানা সেকালের উকিল। জীবনে প্রতিষ্ঠা তাঁর নিজের চেষ্টাতেই হয়েছিল। জীবন সুরু হয় তাঁর বার বছর বয়সে মাসিক দুই টাকা বেতনে গ্রাম্য হিসাব নবীশের মুহুরির কার্যে। পরে দরখাস্ত লেখক, এবং তারও পরে গ্রাম্য উকিল হিসাবে ব্যবসায়ের অনুমতি লাভ করেন তিনি। চরিত্রের দৃঢ়তা, অটুট্ সংকল্প ও মনুষ্য চরিত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে সাফল্য এনেছিল। সুন্দরম্ ছিলেন অতিথি বৎসল, সহরে কোন নূতন লোক বা রাজপ্রতিনিধি কেউ এলে আতিথ্য গ্রহণ করতেন সুন্দরমের বাড়ীতেই। তিরুচাজী সহরে সুন্দরম্ তাঁর পরিবারের বসবাসের নিমিত্ত সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তাঁর বাস ভবনের একাংশ অতিথিদের জন্য ছিল সংরক্ষিত। বাড়ীতে ছিল তাঁর নিয়মিত পূজা অর্চনার ও শাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা এবং মধ্যে মধ্যে ছোট্ট তিরুচাজী সহরের বিখ্যাত প্রাচীন নটরাজের মন্দিরে সপরিবারে যাতায়াত নিয়েই ছিল তাঁর ধর্মজীবন। এক অতি অদ্ভুত নিয়ম ছিল সুন্দরম্ পরিবারে। বংশানুক্রমে এই পরিবারের একজন সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেনই। সুন্দরমের এক পিতৃব্য এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ পথের পথিক হয়েছিলেন।

১৮৭৯ সাল, পৌষের শীতের রাত্রি, আকাশে বাতাসে হিম স্পর্শ, সেদিনটা ছিল আরুদ্র দর্শন অর্থাৎ এইদিন দেবাদিদেব মহাদেব নটরাজরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের নৃত্যে মর্তে দেখা দিয়েছিলেন তাঁর ভক্তদের। সারা তিরুচাজী সহর আজ মেতে উঠেছে উৎসবে। মন্দিরে বিগ্রহকে সাজান হয়েছে পুষ্প মাল্যে। প্রাতঃকাল থেকেই শোভাযাত্রা সুরু হয়েছে তাঁকে নিয়ে, ভক্তের দল মন্দির প্রাঙ্গনাবস্থিত পুস্করিণীতে স্নান সমাপনান্তে সূচীশুভ্র বস্ত্রে ভূষিত হয়ে যোগ দিয়েছেন শোভাযাত্রায়।

বাদ্য ও শঙ্খ-ধ্বনিতে আলোড়িত, ধূপ-ধূনার গন্ধে আমোদিত শোভাযাত্রা প্রদক্ষিণ করছে সারা সহর। প্রাতঃকাল পার হয়ে

মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন, তা'রও পরে রাত্রি সমাগত, উৎসব থামে না। রাত্রি একটায় নটরাজ ফিরে এলেন মন্দিরে, সেই সময় ঠিক সেই মুহূর্তে সুন্দরম্ ও আল্‌গাম্মলের ঘর আলো করে প্রকাশ হলেন দেবাদিদেব ভগবান বেঙ্কটরমণ রূপে।

স্ত্রী আল্‌গাম্মল, জ্যেষ্ঠ পুত্র নাগস্বামী, মধ্যম পুত্র বেঙ্কটরমণ, কনিষ্ঠ পুত্র নাগসুন্দরম্ ও সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা আলামেলুকে নিয়ে ছিল সুন্দরমের সুখী মধ্যবিত্ত পরিবার।

বাল্যকালে বেঙ্কটরমণের লেখাপড়া আরম্ভ হয় স্থানীয় পাঠশালাতে। বাল্যে তাঁ'র প্রতিভা সম্পর্কে কারো মনে কোন রেখাপাত করেনি। এগার বছর বয়সে তাঁ'কে পড়ার জন্য পাঠান হয় দিন্দিগুল ইস্‌কুলে। পিতার ইচ্ছা সেখানেই বালক শিক্ষালাভ করে, কিন্তু অদৃষ্টের ইচ্ছা অন্যরূপ। বার বছর বয়সের সময়ই পিতা সুন্দরম্ করলেন মহাপ্রয়ান।

পিতার মৃত্যুর পর সাংসারিক অসচ্ছলতা সুরু হয়—মাতা আল্‌গাম্মল পুত্রদের মাদুরায় দেবর সুব্বায়ের বাড়ীতে পাঠালেন তাঁর অভিভাবকত্বে বিদ্যাশিক্ষার জন্য। বেঙ্কটরমণ প্রথমে স্কট্‌স্ মিড্‌ল্ ইস্‌কুলে এবং পরে আমেরিকান মিশন ইস্‌কুলে বিদ্যাশিক্ষা কর্‌তে থাকেন। পড়াশুনায় বেঙ্কটরমণের তেমন ঝোঁক ছিল না, কিন্তু মেধা ও স্মৃতি শক্তি তাঁ'র ছিল অসাধারণ, যাকে বলা যায় শ্রুতিধর, তিনি ছিলেন তাই। যে বিষয় একবার শুনতেন তা তাঁ'র মনে গেঁথে থাক্‌ত এবং অবিকল প্রকাশ করতেও পারতেন।

১৮৯৫ সালের শেষভাগে তিরুচাজীর এক প্রবীন আত্মীয় মাদুরায় এলেন। বেঙ্কটরমণ প্রশ্ন করলেন, গতানুগতিক অতি সাধারণ জিজ্ঞাসা—"কোথা হতে আস্‌ছেন এখন"? উত্তরও অতি সাধারণ—"অরুণাচল হতে"। অরুণাচল! বেঙ্কটরমণের সমগ্র সত্তায় অনুভূতি জাগে, আনন্দে দিশাহারা হয় কিশোর। অরুণাচল! অরুণাচল হতে? সে কোথায়? আত্মীয় অবাক হয়ে বলেন—কেন? তিরুভান্নমালয় জান না? তিরুভান্নমালয়ই

তো অরুণাচল। বেঙ্কটরমণের জীবনের প্রথম অনুভূতি এইভাবেই আসে। তারপরে অবশ্য অরুণাচলের চিন্তা বহুকাল তাঁর মনে আসেনি।

কয়েকমাস পরের ঘটনা—দ্বিতীয় অনুভূতি জাগে তাঁর জীবনে, বেঙ্কটরমণ পড়েন পেরিয়া পুরাণ। ৬৩ জন তামিল সাধকের জীবন কথা হচ্ছে এই পেরিয়া পুরাণ। পিতৃব্য এনেছিলেন বইখানি। ধর্ম সম্পর্কে এই তাঁ'র প্রথম পাঠ। খুবই ভাল লাগে পড়তে। জীবজগৎ ছাড়াও অন্য জগতের সন্ধান নিয়ে আসে এই পেরিয়া পুরাণ। ভগবানে অচলা ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের কাহিনী, সাধকের তিতিক্ষা ও জ্ঞান, ভগবানে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, পরমাত্মার সহিত নিবিড় মিলন—কিশোর হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় ঐশ্বরিক সৌন্দর্য—ভক্তির বন্যায় তাঁ'কে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জাগরণ

"আমি" আত্মা, দেহাতীত আত্মা, এই উপলব্ধির সময় হ'তেই বেঙ্কটরমণের সমগ্র চেতনা আত্মায় নিবদ্ধ হ'ল—অন্য আর সমস্ত চিন্তা উদয় ও লয় হ'তে লাগ্‌ল। অন্য কাজ-কর্মও যথারীতি চলতে থাকে কিন্তু আমি এই চিন্তাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে তাঁর মানসিক অবস্থা এরূপ হ'ল যে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পড়াশুনা, খেলাধূলা প্রভৃতিতে তাঁর আর কোন আকর্ষণ রইল না। বন্ধু-বান্ধবের ঠাট্টা বিদ্রূপে যে ধরণের উত্তর ও বাদানুবাদ তিনি কর্‌তেন তাও ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাক্‌ল। এই সময় প্রায়ই তিনি যোগাসনে বসে আত্ম চিন্তায় বিভোর হ'তেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অহরহ বিদ্রূপবান তাঁর মনঃসংযোগ ক্ষুন্ন করতে পারত না এমন কি খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে তাঁর ভালমন্দ বিচারও থাক্‌ত না। এই সময় তিনি নিয়মিত প্রতি সন্ধ্যায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে

যেতেন এবং যুক্তকরে দরবিগলিত ধারায় নটরাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে ঈশ্বরোপলব্ধি করতেন।

খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বেঙ্কটরমণের ধর্মপ্রবণতা ভাল চোখে দেখলেন না—তাঁ'র মত বুদ্ধিমান যুবক যে এইভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন তা' তাঁরা উচিৎ বিবেচনা করলেন না এবং এজন্য প্রায়ই তাঁকে তিরস্কার করতেও লাগলেন। বিদ্যালয়েও পড়াশুনার অবহেলা শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াল না আর তা'র জন্য তাঁ'কে লাঞ্ছিতও হ'তে হ'ল।

১৮৯৬ সাল ২৯শে আগষ্ট তারিখে বেঙ্কটরমণ বেনের গ্রামারের একটা অংশ নকল করছিলেন। স্কুলে পড়াশুনার অমনোযোগীতার শাস্তি স্বরূপ ঐ একই অংশ তিনবার নকল করার জন্য শিক্ষক মহাশয় আদেশ দিয়েছিলেন। ঐরূপ নকল করতে করতে হঠাৎ তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠ্‌ল। এই অসার কাজ আর কতদিন করতে হবে? এ কাজের প্রয়োজনই বা কি? সঙ্গে সঙ্গে খাতাপত্র একপাশে গুটিয়ে রেখে ঈশ্বর চিন্তায় তিনি বিভোর হলেন। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পূর্বাপর সবই দেখছিলেন—ভ্রাতার ধ্যানাবস্থা দেখে তিনি বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লেন—এ অবস্থায় সংসারে থাকার প্রয়োজন কি?

কিশোরের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বিদ্রূপ স্পর্শ করল—সত্যই তো এই অসার সংসারে থাকার প্রয়োজন কি? অরুণাচল! অরুণাচল!! অন্তরের গভীরে সেই মুহূর্তে অরুণাচলের ডাক শুন্‌লেন তিনি, সমগ্র চেতনায় অরুণাচল সমুজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। পিতৃদেব ডাক দিয়েছেন আর তো অপেক্ষা করা চলে না—আর পরবাসী নয়, এই মুহূর্তেই ছাড়তে হবে ঘর—নিজগৃহ অরুণাচলে যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন বেঙ্কটরমণ।

অরুণাচলের পথ তো জানা নেই—কোন্ পথে যাওয়া যায়, কি করে যাওয়া যায়—শেষ পর্য্যন্ত হদিস মেলে পথের—বার করলেন খুঁজে এক পুরাণ রেলের টাইম টেবিল। তিন্দিভানম্,—

তিন্দিভানমই তো তিরুভান্নমালয়ে যাওয়ার নিকটতম রেল ষ্টেশন। আর দেরী সইছে না তাঁর—বেরিয়ে পড়তে হবে। দাদাকে জানালেন বারটায় ইস্‌কুলে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন—বিদ্যুতের বিষয়ে বিশেষ পাঠ নিতে হবে। ঐ পথে তা'হলে আমার কলেজের বেতনও পাঁচ টাকা দিয়ে আসবে, দাদা বল্‌লেন। অন্তর্যামী অলক্ষ্যে হাসলেন—তিরুভান্নমালয়ের পাথেয় সংগ্রহ হ'ল।

যাবার পাথেয় তো ভগবান মিলিয়ে দিলেন—কিন্তু তিন্দিভানমের ভাড়া তিন টাকার বেশী নিশ্চয়ই হবে না—বাঁকী দুই টাকা ও চিঠি রাখলেন বইএর মধ্যে দাদার অবগতির জন্য, লিখলেন—

"পরম পিতার ডাক শুনেছি। তাঁ'রই আদেশে ঘর ছাড়্‌লাম। জ্ঞান লোকের সন্ধানে বাহির হ'লাম সুতরাং কা'রও দুঃখ করবার কিছু নেই! খোঁজার জন্য অর্থব্যয়ও নিরর্থক। আপনার কলেজের বেতন দেওয়া হয় নি, এইসঙ্গে দুই টাকা রইল—ইতি"

বেলা বারটায় তিন্দিভানম্ মাদ্রাজের গাড়ী। বেঙ্কটরমণ চলেছেন দ্রুতপায়—অন্তরে ডাক শুনেছেন পরম পিতার—আয় চলে আয়—আর দেরী নয়—তোর যে সময় হয়েছে। ষ্টেশনে পোঁছিলেন বারটার অনেক পরে কিন্তু তাঁর জন্যই হয়ত গাড়ী আসেনি তখনও—তাঁকে যে যেতেই হবে আজ—এযে পরম পিতার আদেশ। তিন্দিভানমের টিকিট কাটলেন বেঙ্কটরমণ—কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিলেন ফিরতি তিন আনার পয়সা। সামনেই টাঙ্গান টাইম টেবিল দেখার কথা মনে হ'ল না—দেখতে পেতেন তাহলে—তিন্দিভানমের নীচে—তিরুভান্নমালয় ষ্টেশনের নাম এবং ভাড়া ঠিক তিন টাকাই। যাত্রীদের হাঁক ডাক, গাড়ীর শব্দ ও কোলাহল কোন কিছুই তাঁর চেতনায় পৌঁছিল না—গাড়ীতে উঠে বসলেন বেঙ্কটরমণ—তাঁর সমস্ত সত্তা তখন ঈশ্বরময়—বিভোর হয়ে রইলেন তিনি সচ্চিদানন্দে—অবচেতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল অরুণাচল।

সহ যাত্রীদের কৌতূহল অবশেষে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করল। কৈ কিশোর তো আমাদের কোন আলাচনায় যোগ দিল না, এমন কি নির্বাক শ্রোতাও তো হ'ল না আমাদের তর্ক বিতর্কে ? ও যে আপনাতে আপনি বিভোর। কে এই কিশোর ? কিসের ভাবে ও বিভোর ? কোথায় চলেছে সে ?—কিসের সন্ধানে ?— প্রশ্ন জাগে সবার মনে। পাশে উপবিষ্ট বৃদ্ধ মৌলভি প্রশ্ন করেন—"কোথায় চলেছ হে ঠাকুর ?"

—আমি ! আমাকে বল্‌ছেন !

আমিতো তিরুভান্নমালয়ে যাচ্ছি ;

—আরে আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি ;

—কি ? তিরুভান্নমালয়ে ?

—নাহে—তার একটা ইষ্টিশান পরে ;

—বারে ! রেলগাড়ী যায় নাকি তিরুভান্নমালয়ে ?

—কেমন ধারা ছেলে গো তুমি ? তিরুভান্নমালয়ের পথ জান না ? কোথাকার টিকিট কিনেছ হে বাপু ?

—তিন্দিভানমের, উত্তর দিল বেঙ্কটরমণ ;

—ভূল করেছ, ও তো পুরাণ পথ—তিরুভান্নমালয়ের যে নতুন রেলপথ হয়েছে, তোমাকে ভেলুপুরমে গাড়ী বদল করে তিরুভান্নমালয়—কৈলুরের গাড়ী ধরতে হবে হে ঠাকুর।

রাত তিনটায় গাড়ী পৌঁছিল ভেলুপুরমে, নেবে পড়লেন বেঙ্কট-রমণ। সকাল হতেই চললেন পথের সন্ধানে, হেঁটেই যাবেন তিনি তিরুভান্নমালয়ে, পাথেয় যে নেই তাঁর। মাম্বলপট্টুর নাম লেখা রাস্তা মিল্‌ল কিন্তু তিরুভান্নমালয়ের রাস্তাতো মেলে না, জিজ্ঞাসাও করেন না কাকেও—স্বভাব সুলভ সঙ্কোচ পথের সন্ধান লওয়ার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাত্রি জাগরণ ও সকালে ঘোরাঘুরির ফলে ও ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে পড়েন বেঙ্কটরমণ। খুঁজে খুঁজে এক হোটেলের সামনে এসে বসে পড়েন তিনি। কিন্তু কোথায় ক্ষুধা, কিসের পরিশ্রম—বসা মাত্র গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান

তিনি। হোটেলের মালিক নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন তাঁকে। ধ্যান ভঙ্গে যত্ন করে খাওয়ালেন তাঁকে, পয়সার দাবী করেন না, বললেন—ঠাকুর নিয়ে যাও তোমার পয়সা অন্য কাজে লাগিও।

বেঙ্কটরমণ ফিরে চলেন রেল ইষ্টিশনের দিকে। শেষ সম্বল যা ছিল তাই দিয়ে টিকিট কাটেন্ মাম্বলপট্টুর। সেখানে পৌঁছে হাঁটতে আরম্ভ করেন বেঙ্কটরমণ, হৃদয়ে ভগবান মনে ধ্যানের অরুণাচল। কখনও বিশ্রাম করেন কখনও আবার চলেন এইভাবেঁ দশ মাইল পথ অতিক্রম করেন তিনি। কিন্তু পথের শেষ কোথায়? ক্ষুধা ও পিপাসায় আরতো চলার শক্তি নেই তাঁর। অতি কষ্টে রাত্রি ৯টায় কিলুরের বিরাটেশ্বরের মন্দিরে পোঁছে বিশ্রাম নিলেন সে রাত্রি সেখানে।

পরদিন ৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৬ সাল—সেদিনটা ছিল গোকুলাষ্টমী। মুথুকৃষ্ণ ভাগবতের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন বেঙ্কটরমণ। শ্রীকৃষ্ণ জন্মদিনে কোন কৃষ্ণ এসেছিস রে আমার বাড়ী, শুধালেন গৃহকর্ত্রী। খাওয়ালেন তিনি পরিপাটী করে বালক অতিথিকে—পূজার ফল মিষ্টিও সঙ্গে দিলেন ভগবানের নৈবেদ্যের আগেই—বালক যে সাক্ষাৎ ব্রজের কানাই, অতিথি যে ভগবান—বাসুদেব।

পথ চলায় অনভ্যস্ত বেঙ্কটরমণের পা আর ওঠে না। ভাবেন কানের সোনার মাকড়ী ভাগবতকে দিয়ে রেলভাড়া সংগ্রহ করা যায় কি? সঙ্কোচ কাটিয়ে মুখ ফুটে বলেই ফেলেন সে কথা।

—আরে এযে আসল সোনার—ভাগবত বলেন।

—দরকার তো নাও টাকা, চার টাকাই দিচ্ছি, সুবিধে হলেই ফেরত পাঠিও, মাকড়িও আমি ফেরৎ দেব সঙ্গে সঙ্গে। তোমার নাম ঠিকানা দাও আমারটাও নাও।

পথে বেরিয়েই নাম ঠিকানা লেখা কাগজ টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন বেঙ্কটরমণ। কাজ কি আর সোনার মাকড়িতে, পার্থিব সম্পদে প্রয়োজন নেই তার। ইষ্টিশনে পোঁছে রাতটা সেখানেই

কাটান তিনি। প্রত্যুষে চার আনার টিকিট কেটে রেল গাড়ীতে এক ঘণ্টায় পৌঁছে যান তিরুভান্নমালয়ে—তাঁর মানস নেত্রে দেখা পিতৃভূমি অরুণাচলে।

পিতৃসন্দর্শন ও সাধনা

তিরুভান্নমালয়। আকাশচুম্বি গোপুরম ও প্রাচীর বেষ্টন করে রয়েছে মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিশালকায় হাজার স্তম্ভের অলিন্দ ও প্রাঙ্গন চত্বর। দেবাদিদেব মহাদেবের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পঞ্চলিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ তেজলিঙ্গ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। কতশত বর্ষ, কত যুগ যুগান্ত ধরে কত ভক্ত, কত সাধু সন্তদের পবিত্র পদরজ এর প্রতি ধূলিকণাটীকে পূত পবিত্র করেছে। কত সাধক মন্দির অলিন্দে বসে ভগবানের সচ্চিদানন্দ অব্যয় রূপ ধ্যান করে পরম ব্রহ্মে লীন হয়েছেন। কত মহান ঋষি ও পরম পুরুষ দেবাদিদেবের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—সন্নিহিত অরুণাচল পর্বতের গুহা কন্দরে জীবন ব্যাপী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মর্তের মানুষের মুক্তিপথের সন্ধান এনেছেন। এযে সেই পিতৃভূমি—এরই ডাক শুনেছেন কিশোর বেঙ্কটরমণ। অরুণাচল, বেঙ্কটরমণের ধ্যানের অরুণাচল—পৃথিবীর হৃদপিণ্ড অরুণাচল, স্বয়ং শ্রীশঙ্কর যার নাম বলেছেন মেরুপর্বত, পুরাণ যার বর্ণনায় বলেছেন স্বয়ং শিবই অরুণাচল। প্রতি কার্তিকেয় মাসে শিবই তো পর্বতশীর্ষ থেকে মর্তের মানুষকে শান্তির জ্যোতিস্বরূপ আলোকরশ্মি বিকীরণ করেন—এ সেই অরুণাচল আজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে—বলছে—আয় তুই আয়, মন্দির ও পর্বত কন্দর আজ তোরই প্রতিক্ষায় রয়েছে। শতশত বর্ষের জাগ্রত সাধনার ধারা যে আজ তুই পূর্ণ করবি—আয় তোর পিতৃগৃহে আয়।

সদাচঞ্চল মন্দির ও অলিন্দ কেন আজ জনশূন্য? সব কয়টী প্রবেশ পথই তো উন্মুক্ত—মন্দির দ্বার ও রয়েছে খোলা, কই সাধু

সন্ত ভক্ত কেউই তো নেই মন্দিরে? তবে কি আজ স্বয়ং অরুণাচলেশ্বর প্রতিক্ষায় রয়েছেন তাঁর প্রিয়তম পুত্রের? প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে সোজা মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন বেঙ্কটরমণ—সামনা সামনি দাঁড়ান দেবাদিদেবের—অপূর্ব অনুভূতি, জগৎ সংসার লুপ্ত হয় তাঁর কাছে, অপার্থিব শান্তি আচ্ছন্ন করে কিশোরের সমগ্র চেতনা—হৃদয়ে উপলব্ধি হয় অনন্ত অব্যয় চিন্ময় রূপ—পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যান তিনি।

ক্ষণ আসে ক্ষণ যায়, কোন মুহূর্তে কার জীবনে কি রেখাপাত করে কেউ জানে না—বেঙ্কটরমণও নতুন মানুষে পরিণত হ'ন্ সেই মুহূর্তে। সব কিছুই উজাড় করে দেন ভগবৎ পাদপদ্মে, পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন করেন দেবাদিদেবকে; ব্যক্তিসত্তাবোধ লোপ পেয়ে আত্মার গভীরে প্রবেশ করেন সেইক্ষণে। সময়ের গতি মন্থর হতে হতে ক্রমে তার অস্তিত্ব লোপ পায়—একইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন সামনাসামনি দেবাদিদেবের।

চমক্ ভাঙে—ধীরপদে বেরিয়ে আসেন মন্দির অভ্যন্তর হতে—অসন, বসন, অর্থ, যজ্ঞসুত্র সবই নিরর্থক মনে হয় তাঁর কাছে—আত্মার গভীরে যে প্রবেশ করেছেন তিনি। এগিয়ে চলেন পবিত্র সরোবরের তীরে। সবই বিসর্জন দেন সেখানে, ভূষণ বলতে শুধু কৌপিন সার করেন—ফিরে আসেন মন্দির অলিন্দে মস্তক মুণ্ডন করে।

ধ্যানাসন করেন সহস্র স্তম্ভ অলিন্দে, বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়—দিন যায় রাত আসে—আবার দিন হয়—একাগ্র সাধনায় তন্ময় হয়ে থাকেন বেঙ্কটরমণ। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই—মন্দির অলিন্দে সহস্র পথচারীর পদধ্বনি ও গুঞ্জনও কর্ণে প্রবেশ করে না, সর্ব সত্তায় সর্ব চৈতন্যে তিনি তখন ঈশ্বরময়।

ধ্যান গম্ভীর আননে জ্যোতির্ছটা, সুঠাম সুন্দর ঋজু দেহ, আয়ত নয়ন, ধ্যানমগ্ন অপূর্ব দর্শন বালক। কে এই বালক সন্ন্যাসী? কে এই শান্ত সমাহিত মৌন সাধু—কার বুক আলো করা নয়ন

পুত্তলি ? প্রশ্ন জাগে সবার মনে। কাজ কি বাপু প্রশ্নে—চীনা স্বামী (ছোট স্বামী) বা ব্রহ্মণ স্বামীই হোক না নাম। সপ্তাহ পার হয়ে যায়—একই ভাবে—একাসনে অন্তরের গভীরে সাধনায় নিমগ্ন থাকেন ব্রহ্মণ স্বামী।

পরিচর্যারও তো প্রয়োজন, কিন্তু কে করে পরিচর্যা কে নেয় ভার—জটলা করে মন্দিরের সাধু ভক্তজন—শেষ পর্যন্ত শেষাদ্রী স্বামী নিলেন ভার! কিন্তু ভার নিলে কি হবে, শেষাদ্রী স্বামীর যে পাগল ভাব, তাই ফল হ'ল বিপরীত। পাগল স্বভাব শেষাদ্রীর ওপর দুঃস্বভাব ছেলের দল হামলা চালায় সময়ে অসময়ে। এখন সেই হামলা গিয়ে পড়ল ব্রহ্মণ স্বামীর ওপর। লোষ্ট্র নিক্ষেপ থেকে স্বুরু হয় সবরকম অত্যাচার। অনন্যোপায় ব্রহ্মণস্বামী সহস্র স্তম্ভ অলিন্দের অভ্যন্তরে পাতালে অবস্থিত পাতাল লিঙ্গমে প্রবেশ করেন নিরঙ্কুশ সাধন ভজনের জন্য।

পাতাল লিঙ্গম নির্জন হ'লে কি হ'বে? সেখানে কি মানুষ বাস ক'রতে পারে? স্যাঁৎ সেঁতে ভিজে মেঝে, ঘুটঘুটে অন্ধকার, বিছে, পোকা মাকড় ও উঁয়ের আবাসস্থল। কচিৎ কোন লোক তা'র ভিতরে প্রবেশ করে। অবলীলাক্রমে ব্রহ্মণ স্বামী সেখানেই আসন নিলেন—সাধন পথে আর যেন না কেউ বিঘ্ন ঘটায়। স্বুরু হ'ল সাধন ভজন, সঙ্গে সঙ্গে স্বুরু হয় কীট পতঙ্গের দংশন। দংশন হতে ক্ষত, ক্ষত হতে পূঁজ নির্গত হয়—এমন ক্ষত যার চিহ্ন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দেহে ছাপ রেখে দেয়। কিন্তু কাকে দংশন—কে অনুভব করে দংশন? বাহ্যজ্ঞান থাকলে তো বোধ আসবে, দেহ-বোধ যে সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়েছে—পরমানন্দে বিভোর হয়েছেন যে তিনি। পরিপূর্ণ মিলনের নিবিড় শান্তি যে তখন তাঁর সর্বচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত।

বড় সাধক তো কি হয়েছে—ও যে দুধের ছেলে। না খেলে কি বাঁচবে? মায়ের স্নেহ নিয়ে পূণ্যময়ী রত্নাম্মল পাতাল লিঙ্গমে প্রবেশ করেন—সঙ্গে নিলেন খাবার ও শুভ্র বসন। কিন্তু কা'কে

খাওয়াবেন তিনি—কা'র জন্যই বা এনেছেন বসন! আলো আঁধার কাটলে দেখেন রত্নাম্মল—ধ্যান গম্ভীর আনন্দময় চিদ্‌ঘন মূর্তি—স্বয়ং শিব বসেছেন তপস্যায়—বাহ্যচৈতন্য নেই—পৃথিবী বিলুপ্ত তাঁ'র কাছে। বসন নেই দেহে, কীট দংশনে শরীর ক্ষত বিক্ষত। শ্রদ্ধায় নুইয়ে আসে মাথা—সঙ্গে সঙ্গে রত্নাম্মলের মায়ের প্রাণ ব্যথায়ও ভরে ওঠে, অনুনয় করেন—এস্থান তো সাধনার উপযোগী নয়, দেহ তো এখানে থাকবে না, কেইবা করবে তোমার আত্তি—চল আমার ঘরে, স্নেহ যত্ন পাবে, ধ্যান ধারণার বাধাও কিছু নেই সেখানে—আসবে আমার সঙ্গে? কে শোনে কথা, বাহ্যচৈতন্য থাকলে তো কথা কাণে যাবে? দেহ নিস্পন্দ, প্রাণের স্পন্দনও অনুভূত হয় না। কার সঙ্গে কথা বলবেন রত্নাম্মল—কাকে অনুনয় করবেন। পাশে রাখেন বস্ত্রখণ্ড, যদি বসেন তার ওপর, যদি কীট দংশন থেকে রক্ষা পান। ধৈর্যের বাঁধ নিঃশেষ হয়—হতাশ হয়ে ফিরে আসেন রত্নাম্মল।

এদিকে দুঃস্বভাব ছেলের দল নিরস্ত হয় না। পাতাল লিঙ্গমে প্রবেশের ভয় থাকলেই বা কি? দূর থেকেই সুরু হয় ইঁটপাটকেল ভাঙ্গা হাড়ি কলসী ছোঁড়া। ভেঙ্কাটাচল মুদালি যাচ্ছিলেন ঐ পথে। দাঁড়িয়ে পড়েন। কিসের গোলমাল? দুষ্টের দল কার ওপর চালায় হামলা? কাকে ইঁট ছোড়ে? ফিরে তাকিয়ে দেখেন শশব্যস্তে ছুটে আসছেন শেষাদ্রি স্বামী পাতাল লিঙ্গমের ভিতর হ'তে। হতবাক মুদালি জিজ্ঞাসা করেন ব্যাপার কি স্বামীজী? ব্রহ্মণস্বামী কি ধ্যানে বসেছেন ওখানে? আঘাত পান নি তো তিনি?

ব্যস্তসমস্ত শেষাদ্রি বলেন—আঘাত তো লাগেনি কিন্তু দেখেই এসনা অবস্থাটা। ছেলের দলকে উচিৎ শিক্ষা দেন মুদালি—ফিরে এসে প্রবেশ করেন পাতাল লিঙ্গমে শেষাদ্রিকে সঙ্গে নিয়ে। ঘুটঘুটে আঁধার। থাকতে পারে নাকি কেউ এখানে? দৃষ্টি আঁধার কাটে—চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক

স্বর্গীয় ছবি। পদ্মাসনে আসীন নিমিলিত আঁখি নবীন সন্ন্যাসীর আননে উদ্ভাসিত ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ—বদনে অপার শান্তি।

শিউরে ওঠেন মুদালি তাঁর দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সারা অঙ্গে কীট দংশনের ক্ষত—দেহ বোধ কি একবারেই নেই তাঁর? ছুটে বেরিয়ে পড়েন মুদালি, চলে আসেন মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে, কর্মরত সাধুদের জানান ঘটনা। সন্তর্পণে সবাই মিলে তুলে নিয়ে আসেন ব্রহ্মণস্বামীকে পাতাল লিঙ্গম হ'তে, সযতনে বসিয়ে দেন সুব্রহ্মণ্য দেবের মন্দির চত্বরে। চেতনার বৈলক্ষণ কিছু দেখা যায় না, পূর্বাপর একই ভাবে বিভোর থাকেন তিনি। বিস্ময় জাগে সবার মনে।

তু' মাস নিরবচ্ছিন্ন তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন ব্রহ্মণস্বামী একই স্থানে। যত্ন আত্তির ভার নিলেন এক মৌন সাধু স্ব-ইচ্ছায়। তিনি ভগবতী উমার মন্দির ধৌত তুধ, কলা, জল, চিনি প্রভৃতির সংমিশ্রণ যুক্ত একবাটি তরল পদার্থ তাঁর মুখ বিহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দিতেন দিনান্তে একবার খাদ্য হিসাবে। দেহবোধের লেশ থাকলে কি কেউ খায় এই পদার্থ। বাহ্যচৈতন্য যে একবারেই নেই, ভাল মন্দের বিচার কে করবে? মন্দিরের পুরোহিতের দৃষ্টি হঠাৎ পড়ে সেদিকে। করেছ কি হে তোমরা? একি মানুষের খাদ্য? সেই দিন হতে খাঁটী তুধের ব্যবস্থা করেন মন্দিরের পুরোহিত ব্রহ্মণস্বামীর জন্য।

তুই মাস পরে তপস্যা ভাঙ্গে, ব্রহ্মণস্বামী এসে বসেন উন্মুক্ত আকাশের নীচে অলিএণ্ডারের ঝোপের ছায়ায়। বসামাত্র আবার গভীর সমাধিতে বিভোর হয়ে যান তিনি। উদ্যান মধ্যে সমাধি অবস্থায় অজান্তে স্থান পরির্তন হতে থাকে মাঝে মাঝে। এ গাছের তলে তো বসিনি—কি করেই বা এলাম এখানে? গিয়ে বসলেন মন্দির দেবতার শোভাযাত্রার রথ ও শকট যে ঘরে থাকে সেই ঘরে নির্জনে সাধন ভজন তরে। সেই একই অবস্থা, বাহ্য চেতনার লেশ নেই কিন্তু সরে সরে যাচ্ছেন এক রথের

আচ্ছাদনের নীচে হতে অন্য রথের তলে। যান কি করে ধ্যানাবস্থায় অত বাধা অতিক্রম করে অক্ষত শরীরে সেও এক বিস্ময়।

রথের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ব্রহ্মণস্বামী, বসেন এসে বহিঃ-প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগে শোভাযাত্রার পথের পাশে বেলবৃক্ষ তলে। মায়াময় জগৎ হ'তে কোন্ আলোক রাজ্যে প্রবেশ করেন তিনি কে জানে!

১৮৯৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস। কার্তিকেয় উৎসব—প্রতিবছর এই সময় অরুণাচল শিব পর্বতশীর্ষে আবির্ভূত হ'ন আলোক স্তম্ভরূপে। তাইতো পাহাড়ের চুড়োয় অত আলোর ছটা, ঠিকরে পড়ে আলো, সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে অরুণাচলের পাহাড় প্রান্তর—সহস্র যোজন দূরের মানুষও ভক্তিতে লুটিয়ে পড়ে দর্শন করেন অরুণাচলেশ্বর শিব।

যাত্রী, ভক্ত, মুমুক্ষু ও সন্ন্যাসীরদল চলেছেন এইদিনে দেবাদিদেব দর্শনে। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা অরুণাচলেশ্বর শিব দর্শন করে সেই পথেই তো পর্বত পরিক্রমা করে উঠবেন সবাই পর্বতশীর্ষে, দেখবেন তাঁরই ভুবন আলো করা জ্যোতির্ময় রূপ। যাত্রাপথের পাশে এ কোন পরমপুরুষ সমাধিমগ্ন—আহা মরি মরি রূপ আর ধরে না দেহে। ইনিই মানসনেত্রে দেখা সাক্ষাৎ অরুণাচলেশ্বর শিব। আর কোন্ শিব দেখবো আমরা? ভক্ত সাধু পথচারীর দল পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে তাঁর চরণ তলে অন্তরের ভক্তি অর্ঘ জানায়। দেবতার অন্তরে কি ভক্তজনের আকুতি পোঁছায়—কে জানে!

উদান্দি নাইনার আধ্যাত্ম তত্ত্বে নিবিষ্টমনা কিন্তু শান্তি পান না। প্রথম দর্শনেই তাঁর মনে হয় এখানেই পাবেন তিনি তাঁর পরম আকাঙ্খিত নিবিড় শান্তি। ইনিই তো সেই পরমপুরুষ, পরম জ্ঞানী, পরম প্রেয়, পরম শ্রেয়, পরমাত্মায় যাঁর স্থিতি—জ্ঞানাঞ্জন শলাকা যাঁর চক্ষে দেদীপ্যমান—এঁর সেবা করলেই তো মোক্ষ। লেগে পড়েন উদান্দি সেইদিন থেকে তাঁর সেবায়। কিন্তু কি

সেবাই বা করবেন তিনি—কোন কিছুরই তো প্রয়োজন নেই তাঁর। কিছু না হোক পথচারীর কৌতুহল ও দুষ্ট বালকের নিপীড়ন থেকে তো আড়াল করা যায় তাঁকে, সেই কাজেই লেগে পড়েন উদান্দি আর তার সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে চলেন তামিল গ্রন্থ হতে অদ্বৈত তত্ত্বের শ্লোকসমূহ গভীর নিষ্ঠায়।

গাছ তলায় এসে দাঁড়ান আন্নামালাই তাম্‌বিরণ। দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন সোজা ব্রহ্মণ স্বামীর মুখের ওপর, শ্রদ্ধায় শির আনত হয় তাঁর সাধনার উচ্চতায়। প্রত্যহই আসেন যান সেই পথ ধরে, প্রতিবারই আনত হয় শির মহান পুরুষের সান্নিধ্যে, তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি অর্ঘ—জানান তাম্‌বিরণ।

সন্যাসী মানুষ তাম্‌বিরণ, ভগবানের নাম গান ক'রে বেড়ান পথে পথে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে। ভিক্ষা যা মেলে তাই দিয়ে সেবা করেন দরিদ্র নারায়ণের আর পূজার্ঘ নিবেদন করেন তাঁর গুরুকুলের আদি পুরুষকে।

গুরুমুর্তমই তো প্রকৃষ্ট স্থান নিরঙ্কুশ সাধন ভজনের, অন্তরায় তো নেই সেখানে কোন কিছুর—কেমন হয় যদি সেখানে ব'সে তপস্যা করেন ব্রহ্মণ স্বামী—মনে ভাবেন তামবিরণ। প্রকাশ করেন মনোভাব উদান্দির নিকট। সহরের উপকণ্ঠেই তো গুরুমুর্তম। কল কোলাহলের বাহিরে—নির্জনে সাধনার সেই তো প্রকৃষ্ট স্থান—নিয়ে যাওয়াই যাক না মহান তাপসকে সেখানে—উদান্দির কথাটা মনঃপুত হয়, সানন্দে সম্মতি জানান এই প্রস্তাবে।

সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেলেন তাম্‌বিরণ তাঁর অভিপ্রায় ব্রহ্মণস্বামীকে। মৌন সম্মতি গ্রহণ করেন তাঁ'র নিকট হতে—নিয়ে অসেন ব্রহ্মণস্বামীকে গুরুমুর্তমে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

নির্জন নিরালায় আরম্ভ হয় কঠোর তপস্যা। মাথার চুলে জট পাকায়, গায়ে ধুলা কাদার প্রলেপ পড়ে, হাত পায়ের নখ্ বেড়ে

ওঠে, আসনের নীচে পিপীলিকা বাসা বাঁধে, দেহ বেয়ে পৃষ্ঠ সংলগ্ন দেওয়ালে চলাচলের পথ প্রস্তুত করে তারা—ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস একাসনে মুদ্রিত নয়নে মহাযোগী ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন। পিপীলিকা ও কীট পতঙ্গের দংশন, জন সমাগম, ভক্তজনের আকুতি তাঁর যোগ নিদ্রা ভঙ্গ করে না—সর্ব অবয়বে, সর্ব চৈতন্যে তিনি তখন ঈশ্বরময় —সচ্চিদানন্দে বিভোর।

মৌন সাধকের চতুষ্পার্শে বিরাজ করে অপার্থিব শান্তি, আননে উদ্ভাসিত হয় তপঃসূর্য্য।

ভক্তের দল বাড়তে থাকে—শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তা'রা লুটিয়ে পড়েন মহান পুরুষের সান্নিধ্যে এসে—বিস্ময় মানেন তাঁর দেহবোধ বিরহিত অবস্থা দর্শনে। বলাবলি করেন সবাই—এ কোন মহান সাধক—অসীম ধৈর্য, অতুলীয় আত্মসংযম, অপরিমেয় সহ্য ক্ষমতা যাঁর, ভগবানের নাম রূপ ধ্যানে যাঁর নিকট জগৎসংসার বিলুপ্ত, যিনি আত্মানন্দে সর্বদাই বিভোর।

দিন যায়—চারিদিকে একই কথা, যাও দেখে এসো গুরুমুর্তমের মহান সাধককে, মহান যোগীকে। ভক্ত, মুমুক্ষু ও দর্শনার্থী আসতে থাকে দলে দলে তাঁর দর্শনাশায়। কলকোলাহল বেড়ে চলে, নির্জন পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে—বিঘ্ন ঘটায় তপস্যার। শেষপর্যন্ত মোটা বাঁশের বেড়া বাঁধতে হয় তাঁর চতুষ্পার্শে ভীড়ের চাপ হতে রক্ষার জন্য।

তাম্বিরণের ভক্তিও বেড়ে চলে। তাঁ'র মনে বিশ্বাস জন্মায় যে এই পরম পুরুষও যেই বিগ্রহও তো সেই। সেই ভাবেই সেবা করতে চান তাম্বিরণ, নৈবেদ্য সাজিয়ে দেন ব্রহ্মণস্বামীর সামনে দিনের পর দিন। দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাঁর—লিখে রাখেন দেওয়ালে তামিল ভাষায় মহান যোগী—

"খাদ্যের প্রয়োজন শুধ্ দেহরক্ষার জন্য—এর অন্য কোন সার্থকতা নাই—"

তালুকের প্রধান হিসাবনবীশ বেঙ্কটরমণ আয়ার দিনের পর দিন আসেন—একনিষ্ঠ ভক্ত হ'ন ব্রহ্মণস্বামীর। ওই লেখা দেখে মনে হয় তাঁর তা'হলে পরিচয়ও তো জানা যায় ব্রহ্মণ স্বামীর। অনুনয়, বিনয়, কাকুতি চলতে থাকে তাঁ'র নিকট পরিচয় জানানর জন্য। ভয় দেখান, পরিচয় না দিলে তালুকের চাকরি ছাড়বেন, জীবন বিসর্জন দেবেন অনশন করে ব্রহ্মণ স্বামীর সম্মুখে। বৃদ্ধ ভক্তের কাকুতিতে সদয় হ'ন ব্রহ্মণ স্বামী, ইংরাজীতে লেখেন—"বেঙ্কটরমণ—তিরুচাজী"।

লেখাপড়া জানে নাকি ব্রহ্মণ স্বামী? শুধু লেখাপড়া কিগো, ইংরাজী, তামিল সবই জানেন তিনি—ছড়িয়ে পড়ে কথা চারিদিকে। ভক্তি শ্রদ্ধা আরও শতগুণ বাড়িয়ে দেয় তিরুভান্নমালয়বাসীর চিত্তে।

ছ'মাস পরে তাম্বিরণ কার্যব্যপদেশে অন্যত্র যান—ভার পড়ে পরিচর্যার উদান্দির ওপর। তাম্বিরণই তো খাইয়েছেন এতদিন তাঁ'র ভিক্ষান্ন হ'তে—তবে কি এখন উপবাস? ভক্তের বোঝা যে ভগবান ব'য়ে বেড়ান—উপবাস কেন হবে, ভক্তের দল কি শুধু হাতে আসে দর্শনে? ভগবান তা'দের হাত দিয়েই যোগান খাদ্য। উদান্দিও বিদায় নেন্ কয়েক সপ্তাহ পরে। কে করে এখন পরিচর্যা? কে ঠেকায় দর্শনার্থীর ভীড়? স্বয়ং অরুণাচলেশ্বর করেন তার ব্যবস্থা।

মলয়ালী সাধু পালানী স্বামী ভগবান বিনায়কের আরাধনায় একাগ্রমনা। শ্রীনিবাস আয়ার বললেন তাঁকে—পাথরের দেবতার পূজায় কি ফল? যাও স্বয়ং অরুণাচলেশ্বর শিব দেহ পরিগ্রহ করে বসেছেন গুরুমুর্তমে। সেবা কর তাঁ'র, পূজা কর তাঁ'কে—তিনিই পূর্ণ করবেন তোমার মনোবাঞ্ছা।

পালানী স্বামী আসেন গুরুমুর্তমে—সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান চিত্ত। দর্শনলাভ করেন ব্রহ্মণ স্বামীর—মুহূর্তে উপলব্ধি হয় ইনিই তো আমার গুরুদেব—আমার ত্রাণকর্তা—এঁর সেবাইতো আমাকে

করতে হবে জীবনের শেষ দিন—শেষ ক্ষণ পর্যন্ত। সেই তো হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা।

সেই মুহূর্ত হতে পালানীস্বামী তাঁর ইষ্টের সেবায় লেগে পড়লেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ছায়ার মত রইলেন সাথী হয়ে সর্বদা সর্বত্র। ইচ্ছা অনিচ্ছা নিজের বলতে রইল না কিছু—সবই সঁপে দিলেন গুরুর চরণে।

শ্রদ্ধার নৈবেদ্য নিয়ে আসেন ভক্তের দল, সেই হ'তে অল্প অল্প নিয়ে এক পেয়ালা আন্দাজ্ খাবার রাখেন পালানীস্বামী তাঁর জীবন্ত দেবতার দিনান্তের একবারের আহারের জন্য। বাঁকী অংশ ফিরিয়ে দেন ভক্তদের প্রসাদ হিসাবে। কিন্তু অতটুকু খাওয়ায় কি শরীর রাখা যায়? তার ওপর তো চলাফেরা নেই একেবারেই, দেহ অস্থিচর্মসার হয়ে ওঠে ব্রহ্মণ স্বামীর। সেই সঙ্গে ভক্ত দর্শনার্থীর দলও বেড়ে চলে রোজই, তপস্যায়ও বিঘ্ন ঘটতে থাকে।

গুরুমুর্তমের আঠার মাসের বাস শেষ হয়। চলে আসেন ব্রহ্মণ স্বামী নিকটস্থ আম্রকাননে—সঙ্গে আসেন অনুরক্ত শিষ্য পালানীস্বামী। আম্রকাননের মালিক বেঙ্কটরমণ নাইকার কড়া লোক—তাঁর অনুমতি ছাড়া দর্শনাথার কাননে প্রবেশ নিষেধ। আম্র কাননের ছায়ায় ঘেরা উদ্যান চৌকিদারের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে নির্বিঘ্নে চলে সাধনা। ছয়মাস ধ'রে চলে একাগ্রমনে ধ্যান ধারণা ও তপস্যা। পালানীস্বামীও পান অফুরন্ত সময়—দর্শনার্থীর ভিড় নেই এখানে। বই সংগ্রহ করে আনেন্ সহরের গ্রন্থাগার হ'তে, তামিল ভাষায় লেখা বেদান্তের বই,—কৈবল্য নবনীতম, বেদান্ত চূড়ামণি, বশিষ্টম প্রভৃতি।

অর্থ বোধ হয় না—পাঠোদ্ধারে অকৃতকার্য্য হ'ন পালানীস্বামী, ঐকান্তিক চেষ্টা বিফল হয়। ব্রহ্মণ স্বামী চেয়ে দেখেন, সহানুভূতি জাগে তাঁর মনে, চেয়ে নেন্ পুস্তক, পড়ে ফেলেন সব। অসামান্য মেধা ও বুদ্ধি আর সেই সঙ্গে সহজাত স্মৃতি ও সাধনা লব্ধ অনুভূতি

এবং জ্ঞান পাঠোদ্ধারে সাহায্য করে, হৃদয়ঙ্গম হয় সকল অর্থ। তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেন্ বেদান্তোক্ত মত ও পথ। বুঝিয়ে দেন প্রাঞ্জল ভাবে পালানীস্বামীকে এবং প্রশ্নকারীদের।

এই ভাবে সংস্কৃত, তামিল ও মালয়ালম্ ভাষায় লিখিত যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের সারবস্তু সংগ্রহ করেন অল্প আয়াসে ব্রহ্মণস্বামী। তাঁর জীবন দর্শনের ছবি ফুটে ওঠে ধর্মগ্রন্থের পাতায় পাতায়—অপূর্ব মিল খুঁজে পান ঋষি বাক্যের সঙ্গে তাঁর সাধনার ধারায়।

প্রত্যাবর্তনের আশা

বেঙ্কটরমণের অন্তর্ধানে পরিবারের সকলেই বিশেষ দুঃখ অনুভব করেন, বিশেষতঃ মায়ের প্রাণ প্রিয়তম পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনায় অধীর হয়ে উঠল। পরিবারের সকলেই তাঁর অনুসন্ধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারলেন না। যে যা বলে যে দিকে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানায় সেই মতই প্রচেষ্টা চলে কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলে না। ক্রমে তাঁকে পাওয়ার আশা দুরাশায় পরিণত হয়।

সকলেই যখন হতাশ হয়ে তাঁর অনুসন্ধানে বিরত হয়েছেন—সেই সময় হঠাৎ মাদুরায় খুল্লতাত সুব্বায়ের শ্রাদ্ধবাসরে তিরুচাজীর এক যুবক অতি অদ্ভূত এক সংবাদ পরিবেশন করলেন—"তোমাদের বেঙ্কটরমণের খবর শুনেছ কি ? বেঙ্কটরমণ এখন তিরুভান্নমালয়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহান সাধক, খবর জেনেছি এক মঠে আন্নামালাই তাম্বিরণ নামে এক সাধুর নিকট হতে। একথা বলতে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছিল তাম্বিরণের, বল্ছিলেন তিনি—তিরুচাজীর বেঙ্কটরমণ নামে এক কিশোর তাপস সাধনার অতি উচ্চমার্গে ঋদ্ধি সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর ত্যাগ, কঠোর তপস্যা, দেহবোধ

বিরহিত অবস্থা, তিতিক্ষা ও জ্ঞান করেছে তাঁকে সর্বজন মান্য শ্রদ্ধেয় মহান পুরুষ, তিনি নরদেহধারী সাক্ষাৎ শিব। আমার মনে হয় এ তোমাদেরই বেঙ্কটরমণ আর সেই জন্যই ছুটে এসেছি খবরটা দিতে তোমাদের।”

মায়ের আকুতি ও অশ্রুজলে অনুরুদ্ধ হয়ে অন্যতম খুল্লতাত নেলিয়েপ্পিয়ের বেঙ্কটরমণের খোঁজে তিরুভান্নমালয়ে চললেন এক বন্ধুকে সাথী করে। তিরুভান্নমালয়ে পৌঁছে সংবাদ পেলেন গুরু-মুর্তমের এক আম্রকাননে ধ্যানাসীন রয়েছেন বেঙ্কটরমণ—তিনি সেখানে ব্রহ্মণস্বামী নামে পরিচিত। আম্র কাননে উপস্থিত হলেন নেলিয়েপ্পিয়ের কিন্তু বেঙ্কটরমণের দর্শনে বিঘ্ন ঘটালেন আম্রকাননের মালিক নাইকার। বহু অনুনয় বিনয় করলেন নেলিয়েপ্পিয়ের, খুল্লতাত বলে পরিচয়ও দিলেন কিন্তু কাননে প্রবেশাধিকার দিলেন না নাইকার, বললেন,—তিনি তো সংসার আশ্রম ছেড়েই এসেছেন, কি ফল তাঁর সঙ্গে দেখা করে? তার ওপর তিনি মৌন—কথা তো বলবেন না। হতাশ হলেন নেলিয়েপ্পিয়ের, চিরকুট লিখলেন ছোট্ট একটুখানি কাগজে—“মানমাদুরার উকিল নেলিয়েপ্পিয়ের, তোমার দর্শন প্রার্থী।” কাগজের টুক্‌রোটা দিলেন নাইকারের হাতে, বললেন তাকে তোমার মৌন স্বামীকে দাও এই লিখন, যদি ইচ্ছা করেন তবেই নিয়ে যেও আমাদের তাঁর কাছে।

অনুমতি মিল্‌ল। দর্শন মাত্রেই অভিভূত হলেন নেলিয়েপ্পিয়ের। শান্ত সমাহিত ঋষি—ধীর গম্ভীর, যেন কোন্ দূর দূরান্তে ভগবৎ রাজ্যে বিচরণ করছে তাঁর মন, যেন এই পার্থিব জগতের সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, ভালবাসার বহু উর্ধে অনন্ত অব্যয় চিন্ময়ের ধ্যানে তিনি বিভোর। বল্‌লেন নেলিয়েপ্পিয়ের নাইকার ও পালানী স্বামীকে—বংশেরই একজন সাধনার উচ্চস্তরে ঋদ্ধি সিদ্ধি লাভ করেছেন এজন্য পরিবারের সকলেই গর্ব অনুভব করেন কিন্তু আত্মীয় স্বজন কামনা করেন তাঁদের নিকটে থেকেই মহান সাধক যোগ সাধনা করুন। নিয়ে চলুন না আপনাদের গুরুদেবকে

মানমাত্বরার বিখ্যাত যোগাচার্যের আশ্রমে—তপস্যায় নিমগ্ন থাকুন না তিনি সেখানে। কোন বাধা বিপত্তি হবে না স্বজন বন্ধু বান্ধবের নিকট হতে, নিরঙ্কুশ সাধনা চলবে সেখানে—অন্যদিকে সেবার ও তো প্রয়োজন আছে—সেদিক থেকে বরং সুবিধাই হবে।

নেলিয়েপ্পিয়েরের কথায় কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় না ব্রহ্মণ-স্বামীর আননে,—কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে কিনা কথা কে জানে—মনে হয় তিনি যেন উর্দ্ধে কোন্ ভাবরাজ্যে বিচরণ করছেন।

হতাশ হ'ন্ নেলিয়েপ্পিয়ের, বেঙ্কটরমণের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা দুরাশা বলেই মনে হয় তাঁর—আল্‌গাম্মলকে জানান্—

"তোমার পুত্রের সন্ধান মিলেছে—দেখাও করেছি তার সঙ্গে। সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তার, ফিরে পাওয়ার আশা একেবারেই দুরাশা।"

আম্র কাননে নানা কারণে অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় ব্রহ্মণস্বামী পর্বতগাত্রে অরুণগিরির ছোট্ট মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। যাত্রাকালে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন একাই যাবেন সেখানে—পালানীস্বামীকে অনুরোধ জানালেন সঙ্গী না হওয়ার জন্য, বললেন তাঁকে—তুমি তোমার পথে যাও—আমাকে আমার পথে যেতে দাও', আমার ভিক্ষান্ন আমিই করব সংগ্রহ।

গুরুবাক্য স্বীকার করে নিলেন পালানীস্বামী—বেরিয়ে পড়লেন নিজের ভিক্ষান্ন সংগ্রহের তরে। ঘুরে ফিরে মনকে বোঝাতে পারেন না তিনি—ফিরে চলেন অরুণগিরির পথে। মন্দিরে পৌঁছেই বলেন ব্রহ্মণস্বামীকে—কোথায় আর যাব আমি, আর কেনই বা যাব, এখানেই যে রয়েছে আমার মোক্ষ। থেকে গেলেন পালানীস্বামী তাঁর সাথে অরুণগিরি মন্দিরে।

অরুণগিরি মন্দির হতে চলে এলেন ব্রহ্মণস্বামী অরুণাচল পর্বতশৃঙ্গে ঈশ্বর মন্দিরে। মন্দির সংলগ্ন গুহা, নিকটেই ঝরণার অবিরল জলধারা কুলুকুলু স্বরে পর্বতগাত্র বেয়ে চলেছে অজানার পথে—স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে স্থানটি মনোরম, সাধনার উপযুক্ত ভূমি।

মন্দির অভ্যন্তরে গভীব সাধনায় রত হলেন ব্রহ্মণস্বামী। মন্দির পুরোহিত পূজা সমাপনান্তে কোন কোন দিন ধ্যানমগ্ন তাপসকে মন্দির অভ্যন্তরে তদবস্থায় অর্গলবদ্ধ করে চলে যেতেন, এতে তাঁর তপস্যার সুবিধাই হ'ত। ভক্তেব দল ব্রহ্মণ স্বামীকে অনুসরণ করে এখানেও নিয়মিত উপস্থিত হতেন এবং মন্দিরের বাহিরে ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর তপোভঙ্গের প্রতিক্ষায় ঘণ্টার পব ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন।

নেলিয়েপ্পিয়েরের নিকট হতে সংবাদ পাওয়ার পর হতেই মাতা আল্‌গাম্মল পুত্র বেঙ্কটবমণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নাগস্বামী রেজিষ্টারী আপিসেব কেরাণী। তিনি মাতার আগ্রহাতিশয্যে দরখাস্ত কবলেন ছুটীর জন্য। ছুটী মঞ্জুর হ'ল না—সেজন্য বাধ্য হয়ে বড়দিনের ছুটী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হ'ল। ছুটী হতেই নাগস্বামী মাতাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন তিরুভান্ন-মালয়ে। খবব নিয়ে জানতে পারেন বেঙ্কটবমণের অরুণাচল পর্বতে অবস্থানের কথা। পর্বত আরোহণ করেন উভয়ে। মাতাব দৃষ্টি অনুসন্ধান করে চতুর্দিক. ধৈর্য্যের আর বাঁধ মানে না, কোথায় বেঙ্কটরমণ—কোথায় আমার নয়নের মণি—কখন পাব তার দর্শন? আমি যে এখনও বেঁচে আছি তার দর্শন মানসে—ছুটে এসেছি তাকে বুকে নিয়ে শান্তি পাব বলে।

মাতার দৃষ্টি পর্বতগাত্রে শয়ান ধূলিভস্ম আচ্ছাদিত জটাজুট সমন্বিত নবীন তাপসের দিকে নিবদ্ধ হয়। কে ঐ কিশোর সন্ন্যাসী? ঐ কি আমার বেঙ্কটরমণ? হ্যাঁ ঠিকই তো ওই তো আমার হৃদয় মণি, ঐ তো আমার সাধনার ধন—ওরই খোঁজে যে আমরা ছু'টে এসেছি। ও যে বেশেই থাকুক না কেন—আমাকে তো ফাঁকি দিতে পারবে না, মায়ের চোখকে কি কেউ ফাঁকি দিতে পারে? ও যে মায়ের সন্তান।

মাতা ও ভ্রাতার আগমনে কোন চাঞ্চল্য আনে না বেঙ্কটরমণের মনে—নির্বিকার হয়ে শুয়ে থাকেন তিনি, ফিরেও তাকান না

সেদিকে। তিনি যে সংসার ত্যাগী মায়া বিরহিত সন্ন্যাসী, সমস্ত হৃদয় মন ভগবৎ পাদপদ্মে সমর্পণ করে আত্মানন্দে বিভোর হয়েছেন। মায়াবদ্ধ জীব সার বস্তুর সন্ধান পায় না বলেই তো আমার আমার করে বেড়ায়। আল্‌গাম্মল ও নাগস্বামীর কাতর অনুনয় বিনয় অনুকম্পার চক্ষে দেখেন ব্রহ্মণ্যস্বামী।

দিনের পর দিন আল্‌গাম্মল ও নাগস্বামী সহর হতে আসেন মণ্ডা মিঠাই নিয়ে, অনুনয় বিনয়ও চলে অবিরাম কিন্তু পার্থিব আকর্ষণ বিন্দুমাত্র থাকলে তো সাড়া মিল্‌বে? নির্বাক থাকেন তিনি পূর্বাপর। অনুনয়, বিনয়, অশ্রুজল কিছুই তার মনে সাড়া জাগায় না। অবশেষে একদিন মাতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, ক্রন্দন করেন তিনি উচ্চৈস্বরে। নিরুপায় সাধক নিঃশব্দে করেন স্থান ত্যাগ।

পরের দিন আবার আসেন আল্‌গাম্মল। যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন তিনি, করুণ আবেদনও জানান, দেহ ত্যাগের ভীতি প্রদর্শনও করেন কিন্তু সংসার অনুভূতি বিরহিত সাধকের চিত্তে সমবেদনা জাগায় না—ঈশ্বরে সমর্পিত মন সর্বত্যাগী তাপস পার্থিব জগতের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীনই থাকেন।

সমাগত ভক্তজনের কাছে আকুতি জানান আল্‌গাম্মল—ওগো, তোমরা বলোনা আমার ছেলেকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য, নিদেন দুটো কথাও বলুক আমার সঙ্গে, মা বলে জড়িয়ে ধরুক আমাকে—ওযে আমার নয়নমণি, ওযে আমার আত্মজ।

ভক্তজনের মধ্য হতে উঠে আসেন পচাইয়াপ্পা পিলাই, নিবেদন করেন স্বামিজীকে—

"আপনার মাতার করুণ ক্রন্দন ও প্রার্থনা কি আপনি শুনেছেন? কেন আপনি তাঁর কথার উত্তর দিচ্ছেন না? হ্যাঁ কি না একথাই বা বলছেন না কেন?"

মৌনব্রতী সাধক ব্রত ভঙ্গ করেন না, পেন্সিল উঠিয়ে নিয়ে লেখেন—

"পরমেশ্বর প্রত্যেক মানবাত্মার কৃতকর্মানুসারে অর্থাৎ প্রারব্ধ অনুযায়ী বিধিলিপি নির্ধারণ করেছেন, উহা খণ্ডাইবার নহে। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, তাহার বিরুদ্ধে মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন। এজন্য মৌন থাকাই বিধেয়।"

মাতার আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, বেঙ্কটরমনের প্রত্যাবর্তনের আশা একেবারে দুরাশা বলে মনে হয়, নাগস্বামীর ছুটীও ফুরিয়ে আসে, অশ্রুজলে বিদায় গ্রহণ করেন মাতাপুত্র তিরুভান্নমালয় হতে।

সাধনায় সিদ্ধি লাভ

সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল তিরুভান্নমালয়ের মন্দির, অলিন্দ, ধর্ম্মস্থান ও পর্ব্বতগাত্রে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনা ও তপস্যার পর ব্রহ্মণস্বামীর পার্থিব জীবনে ফিরে আসার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়। আহারের প্রয়োজনে আকাশবৃত্তি অবলম্বনই বিধেয় বলে মনে হয় তাঁর, বেরোন তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য। ভক্তজনের দেওয়া আহার্য দ্রব্যাদি বেঁটে দেন সকলের সেবার মানসে, বারণ মানেন না কারো। ভক্ত ও মুমুক্ষুজনের আর্ত্তি ও আকুতি এই সময় তাঁর মনকেও আকৃষ্ট করে। তাদের সাধনপথের সন্ধান তো তাঁকেই দিতে হবে। বিরুপাক্ষ মঠেই প্রথম পথের দিশা মেলে তাঁর নিকট হতে ভক্তজনের।

বিখ্যাত মঠ এই বিরুপাক্ষ গুহা। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বিরুপাক্ষ নামে এক সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এই স্থানে। গুহাভ্যন্তরে সমাধিও আছে তাঁর। তাঁরই নামানুসারে গুহার নাম হয় বিরুপাক্ষ মঠ। ১৯০০ সাল হতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল ব্রহ্মনস্বামী অরুণাচল পর্বতের দক্ষিণ গাত্রের বিভিন্ন মন্দির, মঠ, গুহা ও আশ্রমে সাধনা করেন এবং

এর অধিকাংশ কালই অতিবাহিত করেন তিনি বিরুপাক্ষ মঠে। এই স্থানেই শিষ্য ও ভক্তজনকে সাধন পথের বাণী প্রথম শোনান তিনি। প্রথম কয়েক বৎসর মৌন অবস্থায় থাকা কালীন শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের জন্য শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ হতে সার সংকলন করে লিখে দিতেন তাদের প্রয়োজন অনুসারে। শিষ্য ও ভক্তজন পুস্তকে অধীত বিষয় সম্যক উপলব্ধি না করতে পারলে অথবা উহা তাঁদের যথাযথ বোধগম্য না হ'লে ব্রহ্মণস্বামী তাঁদেব দেওয়া পুস্তক পাঠ করতেন এবং কতক পুস্তকের অধীত বিষয় হতে কতক বা নিজ অভিজ্ঞতা লব্ধ বিষয় হতে লিখে বা বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের। নূতন আলোক পাত করতেন তিনি শাশ্বত জীবনবেদ, আধ্যাত্মিক তত্ব এবং বেদান্ত দর্শনের ওপর, সমস্যার সমাধানও সহজ হয়ে উঠ্‌ত ভক্তজনের কাছে।

চিদাম্বরম্ থেকে এক শাস্ত্রী এলেন শ্রীশঙ্করাচার্যের সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'বিবেকচূড়ামণি' নিয়ে, পড়ে ফেলেন ব্রহ্মণস্বামী বিনা আয়াসে, বুঝিয়ে দেন প্রাঞ্জলভাবে এবং পরে রূপান্তরিতও কবেন বিবেকচূডামণি সহজ সরল তামিল ভাষায় ভক্তজনের অনুবোধে। অসাধারণ স্মরণ শক্তি, সহজাত বুদ্ধি, সতেজ ও গ্রহণক্ষম মন এবং সর্বোপরি তাঁব অন্তর্দর্শিতাব জন্য কোন পুস্তক একবার অধ্যয়ন করলেই যে শুধু অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতেন তাই নয় তাঁর মানসপটে পুস্তকেব প্রতিটী কথা চিরতরে অঙ্কিত হয়ে যেত। বহু বিদ্বান, জ্ঞানী এবং বহুদর্শী ব্যক্তি শ্রীভগবানেব নিকট তাঁদের জ্ঞেয় বিষয় সম্পর্কে অনুপ্রেরণা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। এইভাবে পুস্তকপাঠে ও শ্রবণে এবং আলোচনাব মাধ্যমে শ্রীভগবান দেশের শাস্ত্র সমূহ করেন আয়ত্ত—যদিও শ্রীভগবান শাস্ত্রানুসরণে জ্ঞান লাভ করেন নি—তাঁর জীবন দর্শনের মধ্য দিয়েই শাস্ত্র হয়েছে প্রমাণিত।

অরুণাচলের পূণ্য ভূমিতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌন অবলম্বন কবেন ব্রহ্মণস্বামী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, দিবা রাত্র সমানভাবেই চলতে থাকে তাঁর সাধনলীলা।

মরজগতের সুখ, দুঃখ, ক্ষুৎপিপাসা, দৈহিক অনুভূতি বোধ একেবারে লোপ পায় তাঁর। এই সময় ধ্যানাসনে বসে জগৎ সংসার বিস্মৃত হতেন তিনি এবং ভগবৎচৈতন্যে অবগাহন পূর্বক চিদানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। দৈহিক অস্তিত্বের অনুভূতি থাকত না তাঁর নিকট কোনরূপ এবং সেজন্য কোন প্রকার কষ্টই তিনি অনুভব করতেন না। পরবর্তী জীবনে কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন—"তপোভঙ্গে কখনও দেখ্‌তাম প্রভাত হয়েছে আবার কখনো দেখ্‌তাম সন্ধ্যাকাল। বোধ করতাম না কখন সূর্য্য উদয় হচ্ছে বা অস্ত যাচ্ছে। মন্দিরের স্তোত্রপাঠ শুনতাম্ কোন কোন সময় কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম্ পরক্ষণেই কেন স্তোত্রপাঠ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল—ইতিমধ্যে যে বহুসময় সমাধিমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেছি সে বোধ তখন আমার আস্‌ত না।"

তাঁর সমগ্র জীবনই বেদান্তের মূর্ত উদাহরণ। যাহা কিছু চৈতন্যময়, আনন্দময় তাহা অসীম, নিরাবয়ব, ইহা তাঁহার সহজাত অনুভূতি দ্বারা প্রত্যয় লাভ করেন তিনি। পরবর্তী কালে তিনি নিজেই বলেছেন—

"প্রতি বিষয়ের মূল সেই অখণ্ড, অনাদি, অব্যয়, অনন্ত পরমব্রহ্ম এবং আমি ও ঈশ্বর উভয়েই তা হতে অভিন্ন ইহা তিরুভান্নমালয়ে ঋভূ গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা ও পাঠ শ্রবণে জানতে পারি। কিন্তু তার পূর্বেই সহজাত প্রত্যয় ও অনুভূতি হতে ঐ সকল বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়"।

প্রতি পদার্থে, প্রতি অণু পরমাণুতে, প্রতি মানব হৃদয়ে পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বিরাজমান ইহাই বেদান্তোক্ত বাণী। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম বা আত্মা এক এবং অখণ্ড ইহাই অদ্বৈতবাদ। শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্ত-ভাষ্য তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে। 'আমি' কে? নিরবচ্ছিন্ন এই জিজ্ঞাসা, আমি আত্মা, দেহ নই মন নই প্রাণ নই এই বোধ, আমি ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন এই বিচার, সাধককে

সাধনার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবে—এই তাঁর শিক্ষা এবং ইহাই অদ্বৈতবাদ। তাঁর মতে প্রত্যেক মানবের আত্মানুসন্ধানের অর্থাৎ আত্মবিচারের প্রয়োজন আছে। আত্মবিচারের সঙ্গে সঙ্গে পরমব্রহ্মের সহিত পরিচয় ঘটবে। এই পরিচয় লাভের জন্য কোন আসন বা যৌগিক ক্রিয়াব প্রয়োজন নাই। একমাত্র প্রয়োজন—নির্বন্ধাতিশয়যুক্ত এবং অকপট ভাবে অবিরাম বিচারের দ্বারা মনকে অন্তর্মুখীন্ করা।

অরুণাচল পর্বতের উপর অবস্থিত বিরুপাক্ষ মঠ, সদ্‌গুরু স্বামী গুহা, স্কন্ধ আশ্রম প্রভৃতি স্থানে সুদীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, সাধনা ও তপস্যা দ্বারা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন ব্রহ্মণ স্বামী। মানব সমাজেব প্রতি ছিল তাঁর অপার্থিব করুণা, প্রেম, ও ভালবাসা। দেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রতি মানবের মুক্তি সাধন তরে এবং যাহাতে মানব মাত্রেরই আধ্যাত্মিক জীবন অপাব সুখ, শান্তি এবং আনন্দময় হয় তাব জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানালোকের সন্ধান দিয়েছেন তিনি। আর্ত ও শোকাতুর অনুভব করেছেন তাঁর সান্নিধ্যে এসে শান্তির নির্ঝর ধারা। তাঁর উপস্থিতি সৃষ্টি করেছে জ্যোতিঃ প্রবাহ—সেই আলোকে স্নান কবে মানুষ হয়েছে মরণজয়ী, শাশ্বত, অমর।

পথের দিশা

ব্রহ্মণস্বামী যে সাক্ষাৎ অরুণাচলেশ্বর শিব এই কথাই মনে করতেন ভক্ত অনুরক্তজন, সেই ভাবেই তাঁরা তাঁকে 'শ্রীভগবান' বলেই করতেন সম্বোধন। বিদ্বৎ সমাজে অগ্রগণ্য সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কাব্যকান্ত শ্রীগনপতি শাস্ত্রী অভিহিত করলেন তাঁকে তাঁর সংসারাশ্রমের নাম হতে 'মহর্ষি রমন' বলে সর্বপ্রথম আর সেই সময় হতেই তিনি কথিত হতে থাকেন উভয় নামেই।

শ্রীভগবানের অবসান হয় ব্যক্তিগত জীবনের সহজ সমাধি লাভের পর হতেই। দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব ভুলে আত্মায় সমগ্র চেতনা সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ করতে পারাই নির্বিকল্প সমাধি—ইহা আনন্দময় চৈতন্যময় সমাধি অবস্থা কিন্তু ইহা পূর্ণ স্থায়ী নয়। সহজ সমাধিই সাধনার উচ্চতম অবস্থা এবং সম্পূর্ণ স্থায়ী। মানসিক বা স্থূলরাজ্য অতিক্রম করে চৈতন্যময় অবস্থায় অবিরাম ব্রহ্মে বা আত্মায় অবস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান এবং এই উভয়বিধ অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে মানসিক ও দৈহিক গুণাবলীর প্রকাশই সহজ সমাধি অবস্থা। সাধনার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেন মহর্ষি—লাভ করেন সহজ সমাধি অবস্থা, নিয়োজিত করেন নিজেকে সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণে। তাঁর পরবর্তী জীবনের রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অরুণাচল পর্বতের ওপরে ও তার পাদদেশে আশ্রমে বসে ভক্ত, অনুরক্ত ও শিষ্যগণকে তাঁর উপদেশ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পথ নির্দেশের মধ্য দিয়েই। এই জন্যই শ্রীভগবানের জীবনবেদ অধ্যয়নে প্রয়োজন তার শিষ্য, অনুরক্ত ও ভক্তজনের জীবন কথা ও অভিজ্ঞতার আলোচনা।

শ্রীভগবানের মত ও পথ চিরদিনই এক এবং অভিন্ন—পরিবর্তন হয়নি কোনদিনই তার, যদিও ভক্ত ও শিষ্যের বোধ এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ওপর তাঁর শিক্ষার ধারা করত নির্ভর। যে যেভাবে অগ্রসর হতে চায় তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি সেইভাবেই আর যে একান্ত ভাবেই করেছে তাঁর নিকট আত্ম সমর্পন ও নির্দেশ চেয়েছে তাঁর মত ও পথের তাঁর নিজস্ব ধারায় তাকে করেছেন পরিচালিত। নিজের মত ও পথ কারো ওপর চাপিয়ে দেননি তিনি কোনদিন। ভক্তজনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন আর উপদেশ অধ্যাত্ম জগতে করেছে সৃষ্টি অমূল্য সম্পদের। বিরুপাক্ষমঠে বিশ্ববাসী শ্রবণ করেন মহর্ষির শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী সর্বপ্রথম। সচকিত হয়ে

ওঠে সারা বিশ্ব, কাতারে কাতারে এসে উপস্থিত হয় পৃথিবীর সর্বদেশের মুমুক্ষু ভক্তজন দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট তিরুভন্নামালয় সহরে এ যুগের মহা মানবের দর্শনাকাঙ্খায়,—আরোহন করে অরুণাচল পর্বতে, সন্ধান করে শ্রীভগবানের আশ্রয়গুহা—উপস্থিত হয় তাঁর সান্নিধ্যে, অনুভব করে অপার শান্তি—ভগবৎপ্রেমে ভরে ওঠে সারা হৃদয় মন।

কথা অবান্তর মহর্ষির নিকট—সান্নিধ্যে এলেই অনুভূত হয় অপার শান্তি, ভগবৎ প্রেরণা জাগে হৃদয়ে। নীরব ভাষাই হয় অধিক শক্তিশালী, তাঁর মৌন দৃষ্টি অনুভব করায় অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁর মর্মবাণী। ভাষার স্থান নেই সে রাজ্যে—মৌন ভাষা জাগায় অন্তরে অপার শান্তিও আনন্দ। তাঁর সামনে সবার হৃদয়ই খোলা কপাট, বুঝে নেন্ তিনি কার কি আকুতি, বেদনা ও জিজ্ঞাসা। বিকিরণ হয় স্বর্গীয় জ্যোতিঃপ্রবাহ তাঁকে ঘিরে—সেই প্রবাহে অবগাহন করে ভক্ত ও অনুরক্তের দল সাধনার উচ্চতম শিখরে করেন আরোহন—বহুযুগ ধরে সাধনায় যা না হয় সম্ভব জ্যোতিঃ তরঙ্গের স্পর্শে তা হয় মুহূর্তে পূর্ণ, ভক্ত উপলব্ধি করে অন্তরে পরমব্রহ্মের অনন্ত অব্যয় চিন্ময় রূপ, স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে —ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

কত শত দুঃখী ছুটে এসেছে তাঁর নিকট দিগ্ দিগন্ত হতে সান্তনার জন্য, শান্তির জন্য, তাঁর সান্নিধ্যে এসেই অনুভব করেছে অপার শান্তি, দূর হয়েছে দুঃখ, উপশম হয়েছে বেদনার। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজেকে করেছে বিচার, লাভ করেছে ভগবৎ প্রেরণা হৃদয়ে—নূতন কর্মজীবন তথা ধর্মজীবন সুরু হয়েছে সেই আলোক স্নানে, অনুভব করেছে শাশ্বত জীবন।

মহর্ষির পথ সোজা ও সরল। সে পথে যৌগিক ক্রিয়ার নেই প্রয়োজন, প্রচেষ্টাও নেই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণ প্রবাহ রোধের। তাঁর সকল শিক্ষার সার শিক্ষা আত্মবিচার—"আমি কে" অন্তরে নিরন্তর এই জিজ্ঞাসা। তাঁর মতে দেহ

এবং মন ক্ষণস্থায়ী—যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা অসত্য, তাহাকে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না—একমাত্র যাহা চিরস্থায়ী যাহা সত্য এবং শাশ্বত তাহা আত্মা বা ব্রহ্ম, নিরন্তর আত্ম বিচারে সেই সত্যই জ্বলন্ত হয়ে ওঠে মানব হৃদয়ে—অন্য চিন্তা পায়না প্রবেশ পথ। একমাত্র আত্ম বিচারের দ্বারাই মনকে করা যায় চিন্তাশূন্য এবং স্থির, অন্য পদ্ধতি যদিও হয় সাময়িক কার্যকরী, লাভ করা যায় না তাতে স্থায়ী ফল। চিন্তাশূন্য মনই যে অন্তরের গভীরে প্রবেশের প্রথম সোপান।

'আমি' ও 'আত্মা' এক এবং অভিন্ন—ইহা প্রাণময়, চৈতন্যময় ও আনন্দময়। কিন্তু চিন্তাযুক্ত মন রচনা করে পৃথক সত্তা। গভীর নিদ্রায় যখন মন হয় শান্ত, তখন থাকে না দেহবোধ—'আমি' এবং 'আত্মা' হয় এক—সেই অনুভূতি লাভ হয় অজ্ঞান অবস্থায়। কিন্তু সমাধির অবস্থা পূর্ণ চৈতন্যের অবস্থা, পূর্ণজ্ঞানের অবস্থা—মানুষ ও আত্মা তখন এক ও অভিন্ন বলেই হয় অনুভূত, মানুষ অন্ধকার হতে পূর্ণজ্যোতিতে করে প্রবেশ। মহর্ষি বলেন প্রয়োজন এ অবস্থার জন্য গুরুর কৃপা—গুরু যে কেবল দেহধারী গুরুই হবেন তা নয়, মানুষ নিজেই নিজের গুরু হতে পারে—সাধন পথে 'আত্মা' বা 'ব্রহ্মই' যে তার শ্রেষ্ঠ গুরু। মহর্ষির নিজের ক্ষেত্রেই তো মেলে না দেহধারী গুরুর সন্ধান—অনুভূতি আসে তাঁর 'অরুণাচল' এই শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—স্বয়ং অরুণাচলেশ্বরই যে তাঁর গুরু।

যুগে যুগে প্রকাশ হয়েছেন ভগবান এই পবিত্র ভারত ভূমিতে পৃথিবীর মানুষের দুঃখতাপ নিবারণের জন্য, মুক্তি পথের, জ্যোতিঃ রাজ্যের পথ নির্দেশের তরে। উনিশ্শ শতাব্দীতে বাংলা দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে শ্রীরমণ মহর্ষি প্রকট হয়ে করেছেন যে জ্যোতিঃ বিকিরণ তা হয়েছে শত শত বর্ষ ব্যাপী জগতের মুক্তিকামী মানবের আলোক বর্তিকা।

প্রথম জীবনের ভক্ত অনুরক্তজন

গণপতি শাস্ত্রী

কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রী গণপতি মুনি নামেই ছিলেন সমধিক পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য। যখন তাঁর বয়স দশ বছর মাত্র সেই সময় তিনি লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায় সুললিত কবিতা এবং সেই বয়সেই তিনি পারদর্শিতা লাভ করেছেন সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণে। বার বছর বয়সেই মহাকবি কালিদাসেব মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচনা করেছেন তিনি ভৃগুসন্দেশ পুস্তক। চোদ্দ বছর বয়সে লাভ করেন পঞ্চতীর্থ উপাধি এবং এই সময় হতেই পারতেন তিনি অনর্গল ভাবে বলতে ও লিখতে সংস্কৃত ভাষায়। ১৯০০ সালে নবদ্বীপধামের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে এবং মুখে মুখে সুললিত কাব্য রচনা ও বিচার বিতর্ক শ্রবণে 'কাব্যকান্ত' উপাধিতে ভূষিত কবেন তাঁকে। ভারতের প্রাচীন মুনি ঋষিদের ভাবধারাব প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং নিজ জীবনে প্রতিফলিত কববেন সেই ভাব-ধারা এই ছিল তাঁব দৃঢ় সঙ্কল্প। একদিকে অধ্যাপনা শিক্ষণ প্রভৃতি আর অন্যদিকে সাধন মনন তপস্যা এই নিয়েই কবেছেন তিনি তাঁব জীবন উৎসর্গ।

১৯০৩ সালে কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রী সর্বপ্রথম আসেন তিরুভান্নমালয়ের জাগ্রত দেবতা পঞ্চলিঙ্গের অন্যতম তেজলিঙ্গের উপাসনাব তরে এবং এই সময় অরুণাচল পর্বতোপরে বিরুপাক্ষ গুহায় শ্রীভগবানেব দর্শন লাভও কবেন তিনি। মন্দিরের ঐতিহ্য এবং স্থান মাহাত্ম্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তাঁকে এবং সেজন্য তিনি তিরুভান্নমালয়ের অদূরে ভেলোরে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ভেলোরেই তিনি আরম্ভ করেন নিজ-শিষ্যবর্গ সহ গভীর শক্তি উপাসনা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের তরে। উপাসনা, ধ্যান, ধারণা চলতে থাকে অবিরাম তাঁকে ঘিবে, জুটতে থাকে শিষ্য ও অনুরক্তের দল—এ কার্যে তিনি এতই ব্যাপৃত হ'ন যে শেষ পর্য্যন্ত

শিক্ষকতা ছাড়তে হয় তাঁকে। ফিরে আসেন তিনি তিরুভান্নমালয়ে ১৯০৭ সালে। মানব কল্যাণের নিমিত্ত মহাশক্তি লাভ দুরূহ বলেই মনে হয় তাঁর—হতাশ হয়ে পড়েন তিনি—অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র-জ্ঞান বৃথা বলেই মনে হয় তাঁর, আধ্যাত্মজগতে প্রবেশ পথ খুঁজে পান না তিনি।

তিরুভান্নমালয়ের সর্বজন প্রতীক্ষিত কার্তিকেয় উৎসব আসে—অগনিত জনস্রোত নিত্য চলে পর্বত প্রদক্ষিণ করে পর্বতোপরে বিরুপাক্ষ আশ্রমে শ্রীভগবানের চরণ বন্দনা মানসে। উদাস নয়নে চেয়ে থাকেন শাস্ত্রী—পথ খুঁজে পান না। উৎসবের নবম দিনে হঠাৎ মনে উদয় হয় শ্রীভগবানের কথা। যেমন্ উদয় হওয়া সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্র অগ্রাহ্য করে করেন তিনি পর্বত আরোহন—অগ্রসর হতে থাকেন বিরুপাক্ষ আশ্রমের দিকে। সমস্ত শরীর কম্পিত হতে থাকে তাঁর। শ্রীভগবান একাই ছিলেন গুহার সম্মুখে চত্বরে আসীন—যেন একমাত্র শাস্ত্রীরই আগমন প্রতীক্ষায়। উপস্থিত হয়েই শাস্ত্রী জড়িয়ে ধরেন তাঁর রাতুল চরণ-যুগল—আবেশ কম্পিত স্বরে বলেন—যাহা কিছু অধ্যয়ন করা যায় সবই করেছি অধ্যয়ন—বেদ-বেদান্ত এবং শাস্ত্র-নিচয় করেছি অধিগত, সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে করেছি ধ্যান ধারণা ও তপস্যা কিন্তু অনুভূতি জাগেনি প্রাণে—তপস্যার শিখরে পারিনি আরোহণ করতে। একান্তভাবে ছুটে এসেছি অপনার চরণাশ্রয়ের তরে—আশ্রয় দিন ঐ রাতুল চরণ-যুগলে—করুণা বারি সিঞ্চনে আমার হৃদয় মনকে করুন সঞ্জীবিত। তপস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়ে করুন কৃতার্থ।

মৌন-নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে থাকেন শ্রীভগবান শাস্ত্রীর পানে প্রায় পনের মিনিট কাল, পরে বলেন তাঁকে—

"যদি কেউ স্থিরভাবে লক্ষ্য করে 'আমি' এই বোধ কোথা হতে উত্থিত হয় এবং সমস্ত হৃদয় মন তাতেই নিমগ্ন করতে পারে—তবে তাহাই তপস্যা।"

পুনরায় বলেন তাঁকে—

"যদি কেউ মন্ত্র জপের সময় লক্ষ্য করে কোথা হতে মন্ত্রধ্বনি উত্থিত হয় এবং তাহাতেই সমস্ত হৃদয় মন নিবিষ্ট করতে পারে তবে তাহাই তপস্যা।"

শ্রীভগবানের কথায় যত না হোক—তাঁকে ঘিরে যে করুণা-রশ্মি নির্ঝর ধারায় ঝরে পড়ছিল শাস্ত্রীর সমস্ত সত্তা তাতেই হয় আনন্দে পরিপ্লুত—হৃদয় মন কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে সার্থকতায়। ভাবের আবেশে কাব্যকান্ত সেই মুহূর্তে শ্রীভগবানের প্রশস্তিকাব্য করেন রচনা—সম্বোধন করেন শ্রীভগবানকে—"শ্রীরমণ নামে" তাঁর সংসার আশ্রমেব নামানুসারে সর্বপ্রথম—উল্লেখ করেন তার কাব্য সম্ভারে 'মহর্ষি রমণ' নামে তাঁকে বারংবার।

শ্রীভগবানের সঙ্গে সাক্ষাতের একবছর পর হতেই শাস্ত্রী প্রবলভাবে অনুভব কবেন হৃদয়ে তাঁর করুণাধারা। তিরুভতিয়ুরে গণপতি মন্দিরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি একান্তভাবে কামনা করেন শ্রীভগবানের উপস্থিতি ও নির্দেশ। প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়, শ্রীভগবান ভক্তের ডাকে আবির্ভূত হ'ন গণপতি মন্দিরে শাস্ত্রীর সম্মুখে। সাষ্টাঙ্গে ভক্তিভরে প্রণিপাত করেন শাস্ত্রী শ্রীভগবানের চরণে—উত্থান কালে অনুভব করেন মস্তকে শ্রীভগবানের শ্রীকরকমল স্পর্শ—তড়িৎ প্রবাহ অনুভব করেন তিনি—প্রবল শক্তি সঞ্চার হয় সর্বদেহে—স্পর্শজাত গুরুকৃপা লাভ করে ধন্য হ'ন গণপতি শাস্ত্রী।

পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখে শ্রীভগবান বলেন—"কয়েক বছর আগে জেগেই শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ অনুভব করলাম ক্রমশঃ উপবে উঠ্ছে আমার দেহ—নীচের দৃশ্য ছোট হতে হতে অবশেষে মিলিয়ে গেল—চতুর্দিক সীমাহীন অন্তহীন উজ্জ্বল আলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠ্ল তারপরে আস্তে আস্তে অবতরণ করতে লাগ্লাম এবং জাগতিক দৃশ্য সমূহ আবার নয়ন গোচর হতে থাক্ল—তখনই

সহজাত বোধশক্তি স্মরণ করিয়ে দিল সিদ্ধ যোগীরা এইভাবেই সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে অল্প সময়ে ইচ্ছামত দূরবর্তী স্থানে প্রকাশ ও অদৃশ্য হ'ন। নীচে নামতেই মনে হ'ল তিরুভতিয়ুরে এসেছি, যদিও তার পূর্বে কোনদিনই তিরুভতিয়ুরে যাইনি। বড়রাস্তার উপরেই অবতরণ করলাম এবং হেঁটে অল্পদূরে গণপতি মন্দিরে প্রবেশ করি। এর পরের ঘটনা আর আমার স্মরণ নেই, তারপর জেগে উঠে দেখলাম বিরূপাক্ষ গুহায় শয়ন করে আছি। আমি তৎক্ষণাৎ এই ঘটনার কথা পালানীস্বামীকে বিবৃত করি। ১৯১৭ সালে গণপতি শাস্ত্রী প্রশ্ন করেন শ্রীভগবানকে—"যোগী যদি কোন বিশেষ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে যোগ সাধনা করেন এবং সেই ইচ্ছা পূরণের পূর্বেই যদি সাধন জনিত জ্ঞান লাভ করেন—তাহ'লে কি পরিণামে তাঁর মূল উদ্দেশ্য সফল হবে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করেন শ্রীভগবান—"যোগী ইচ্ছা পূরণ কল্পে যোগ সাধন দ্বারা যদি জ্ঞান লাভ করেন এবং পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়—তাহা হইলে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার জন্য তিনি আর অযথা উল্লসিত হবেন না।" শ্রীভগবান যে সময় তাঁর অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও তপস্যা দ্বারা সহজ-সমাধি অবস্থা লাভ করেন এবং অদ্বৈত জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে বেদান্তোক্ত মত ও পথ এবং অন্যান্য শাস্ত্র নিচয় আহরণ করতে আরম্ভ করেন ঠিক সেই সময় শ্রীগণপতি শাস্ত্রী তাঁ'র অসাধারণ মেধা, বাগ্মিতা, প্রখর বুদ্ধি-বৃত্তি ও সংস্কৃত বিদ্যাবত্তা নিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীভগবানের নিকট। এতে শ্রীভগবানের সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র অনুধাবন করতে এবং ঐ ভাষায় ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও টীকা সংকলনে প্রভূত সাহায্য হয়। শাস্ত্রী তপস্যালব্ধ শক্তি সঞ্চয় দ্বারা পৃথিবীর কল্যাণ করবেন এই অভিলাষ চিরদিনই পোষণ করেছেন।

১৯৩০ সালে তিনি আশ্রম গঠন করেন খড়্গাপুরের নিকট নিমপুরা গ্রামে। শিষ্য, ভক্ত ও অনুরক্ত জন সহ ১৯৩৬ সালে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিজ আদর্শে বিশ্বাসবান থেকে একদিকে

মহর্ষি প্রদর্শিত পথে ধ্যান ধারণা ও তপস্যা ও অন্যদিকে নিজ ইচ্ছা পূরণ কল্পে সশিষ্য আরাধনা করেন তিনি।

এইচ্ এফ্ হামফ্রি

মিঃ এইচ্, এফ, হামফ্রি জাতিতে ইংরাজ। ভারতবর্ষে আসেন তিনি ১৯১১ সালে পুলিশ সুপারের্ চাকুরি নিয়ে। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রবন, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস আর অভ্যাসও করতেন তিনি ঐ পথে শক্তিলাভের। ইংলণ্ড হতে জাহাজযোগে যেদিন তিনি বোম্বাই পৌঁছিলেন সেই দিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বোম্বাইয়ের হাসপাতালে সে জন্য তাঁকে প্রায় দু'মাস অবস্থান করতে হয়।

আরোগ্য লাভের পর তিনি আসেন দক্ষিণভারতের ভেলোর সহরে পুলিসের কাজে শিক্ষণলাভের উদ্দেশ্যে। এম্, নরসিংহম্ নামে এক ব্যক্তি সেখানে মুন্সী নিযুক্ত হ'ন তাঁকে তেলেগু ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য। হামফ্রি প্রথম দিনই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন সে অঞ্চলের কোন মহাত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কিনা? নরসিংহম্ উত্তরে জানান যে সেরূপ কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।

পরদিন হামফ্রি তাঁর শিক্ষককে বলেন যে পূর্বদিনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঠিক কথা বলেন নি; তিনি আরও জানান যে সেদিন প্রত্যুষে নিদ্রিত অবস্থায় নরসিংহমের গুরুদেবকে তিনি দর্শন করেছেন, সেই মহাপুরুষ হামফ্রির পাশে এসে বসেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে বোম্বাই সহরে পৌঁছেই ভেলোরের অধিবাসী হিসাবে প্রথম যাকে তিনি দেখেন তিনি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং নরসিংহমই। ঐ কথার প্রতিবাদে নরসিংহম্ জানান যে তিনি কখনও বোম্বাই যান নি। হামফ্রি বলেন বোম্বাইয়ের হাসপাতালে অবস্থান কালে তিনি তাঁর অতীন্দ্রিয় মনকে ভেলোর অভিমুখী করেন এবং সেখানে তিনি মুন্সিকেই প্রথম দেখেন।

এরপর নরসিংহম তাঁকে সাধু মহাত্মাদের কয়েকখানি ছবি দেখান। তার মধ্য হতে হামফ্রি গণপতি শাস্ত্রীর ছবি দেখিয়ে মুন্সিকে জিজ্ঞাসা করেন তিনিই তাঁর গুরু কি না? স্বপ্ন দর্শনের সঙ্গে ঐ ছবির সাদৃশ্য আছে বলে তিনি জানান। মুন্সি সবিস্ময়ে স্বীকার করেন তিনিই তাঁব গুরু।

এর পর হামফ্রি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধাবের জন্য উটাকামণ্ডে যান। সেখানে সাধু মহাত্মাদেব চিন্তাতেই তাঁর সময় কাটে। জলবায়ুর গুণে শীঘ্রই স্বাস্থ্য ফিরে পান তিনি। ফিবে আসেন ভেলোরে এসিস্‌টেণ্ট পুলিস সুপারের কাজ নিয়ে। পূর্বেব মত আবার চলতে থাকে মুন্সির নিকট তাঁর তেলেগু শিক্ষা। কয়েক দিন পবে নরসিংহমের নিকট পাঠাভ্যাসের সময় হামফ্রি পেন্সিল দিয়ে কাগজেব ওপর ছবি আঁকেন এক পর্বত গুহার—গুহাব দ্বাবদেশে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্যমূর্তি এক তাপস—গুহার সামনে বয়ে চলেছে এক নির্ঝরিনী। মুন্সিকে দেখালেন ঐ ছবি—বললেন, পূর্বরাত্রে স্বপ্নে দেখেছেন তিনি ঐ ছবি এবং জিজ্ঞাসা করলেন এব অর্থ কি? নবসিংহম উপলব্ধি করলেন বিরূপাক্ষ গুহায় শ্রীভগবান ভিন্ন এই মহাত্মা আর কেউ নন্। তিনি তাঁব ছাত্রকে জানালেন সে কথা আব সেই সঙ্গে সবিস্তারে শোনালেন শ্রীভগবানের যোগ ঐশ্বর্য্যের কথা—তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কথা। এই ভাবে কাবো সাহায্য না নিয়েই হামফ্রি পরিচয় লাভ করেন অরুণাচলের পবিত্র পর্বতোপরে শ্রীভগবানেব।

কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীভগবানের সহিত দর্শনেব সুযোগ এসে গেল হামফ্রির। কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রী চললেন তিরুভান্নমালয়ে থিয়সফিকাল্ সোসাইটীর সভায় যোগদানের জন্য। ইতিমধ্যে নরসিংহমের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছেন তিনি গণপতি শাস্ত্রীর সঙ্গে —এবং তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব দর্শনে। তিরুভান্নমালয় যাবার পথে হামফ্রিকে সঙ্গে নিলেন শাস্ত্রী—শ্রীভগবানের নিকট তাঁকে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে।

শ্রীভগবানের সহিত পরিচয় বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল হামফ্রির জীবনে। অতীন্দ্রিয় দর্শন এবং অলৌকিক শক্তি লাভ যে ঈশ্বর প্রাপ্তির সহায়ক নয় একথা উপলব্ধি করলেন হামফ্রি। ঐ পথে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায় সত্য কিন্তু উহার যথেচ্ছা ব্যবহার অধ্যাত্ম জগৎ হতে সরিয়ে নিয়ে যায় সাধককে। সাধনায় সহায়ক না হয়ে পরিণামে উহা অন্তরায় হয়েই দাঁড়ায়। হামফ্রির জীবনধারা প্রবাহিত হল নতুন পথে—তাঁর অশান্ত ব্যাকুল মন সন্ধান পেল অনন্ত অব্যয় পরমব্রহ্মের—সারা দেহ মন ছেয়ে গেল নিবিড় শান্তিতে। মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের নিম্নোক্ত বিবরণ হামফ্রি নিজেই দিয়েছেন—

"একদিনের ছুটি নিয়ে মুন্সিকে সঙ্গে করে শাস্ত্রীর কাছে যাই তারপর তিনজনই তিরুভান্নমালয় যাত্রা করি। অরুণাচল পর্বতে আরোহণ করি বেলা দু'টায়— বিরূপাক্ষ গুহায় পৌঁছে বসি সবাই মহর্ষির পদতলে। কারো মুখে কোন কথা নেই—সবাই মৌন, শুধু অন্তরে উপলব্ধি করছি অন্তরের ভাষা। বহু সময় উত্তীর্ণ হ'য় এ অবস্থায়—ধীরে ধীরে অনুভূত হ'তে লাগ্‌ল আমি দেহ নই—আমি দেহ হ'তে পৃথক। চেয়েছিলাম অনিমেষ নয়নে মহর্ষির পানে—দেখলাম তাঁর নয়নযুগল গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন—বোধ জন্মাল আমার দেহ মন্দির পরমাত্মার পরমব্রহ্মের আধার স্বরূপ। উপলব্ধি হ'ল মহর্ষির দেহ মহর্ষি নন্—তাঁর আধার মাত্র—এই অনির্বচনীয় অনুভূতি প্রকাশের ভাষা আমার নেই। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন শাস্ত্রী—বললেন আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে মহর্ষিকে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম—জিজ্ঞাসা করলাম শ্রীভগবানকে কি ভাবে লাভ করব দিব্যজ্ঞান—কি করে পাব আলোকের সন্ধান—প্রবেশ করব জ্যোতিঃতে। নিবিষ্ট মনে গভীর শ্রদ্ধায় শ্রবণ করলাম তাঁর বাণী। জিজ্ঞাসা করলাম—

—ভগবান, জগতের কোন সাহায্যে কি আমি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারব?

—নিজেকে সাহায্য কর তাহলেই জগতকে সাহায্য করা হবে।

—আমি চাই জগতের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে, পারব না কি এরূপ কোন সাহায্য করতে?

—হ্যাঁ পারবে, নিজেকে সাহায্য করেই তুমি পারবে জগতকে সাহায্য করতে। তুমি জগতে আছ এবং তুমিই জগৎ। তুমি জগৎ হ'তে ভিন্ন নও এবং জগৎও তোমা হ'তে ভিন্ন নয়।

—ভগবান যীশু ও শ্রীকৃষ্ণ জগতে অলৌকিক কাজ সমূহ করে গেছেন—আমি কি তা পারব করতে?

—যীশু ও শ্রীকৃষ্ণ যখন কাজ করেছেন তখন কি তাঁরা ভেবেছেন যে যা তাঁরা করছেন তা স্বভাবের নিয়মের বাইরে? তা অলৌকিক?

—না ভগবান।"

হামফ্রির মনের অবস্থা হতে অলৌকিক শক্তির ওপর তার আকর্ষণ বুঝে নিলেন মহর্ষি। বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে অলৌকিক কাজের শক্তি স্থায়ী নয়, যা স্থায়ী তা অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম—তারই ধ্যান করবে। 'আমি' বা 'আত্মাই' 'ব্রহ্ম', মনকে নিবিষ্ট করবে সেইদিকে—সচ্চিদানন্দে হতে হবে বিভোর—তবেই হবে দিব্যজ্ঞান লাভ।

মহর্ষির আকর্ষণ অনুভব করেন হামফ্রি, সাক্ষাৎ করলেন তিনি আবার মহর্ষির সঙ্গে। এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন তিনি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে প্রায় ষাট মাইল মোটর বাইক্ যোগে ভেলোরের ধূলি ধূসরিত রাস্তা অতিক্রম করে। যখন পৌঁছিলেন তিনি পর্বতোপরে বিরূপাক্ষ গুহায়—সর্বদেহ তাঁর ঘর্মাক্ত—মুখ লাল, চোখ জবাফুল বর্ণ—সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মহর্ষি যেন তাঁরই প্রতিক্ষায়—একটুও বিস্মিত হলেন না তাঁকে দেখে—হাসলেন তাঁর দিকে চেয়ে। এবারের সাক্ষাতের বিবরণও দিয়েছেন হামফ্রি নিজে নিম্নরূপ—

"ভিতরে প্রবেশ করলাম মহর্ষির নির্দেশে, বসবার পূর্বেই আমার ব্যক্তিগত একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, যে

বিষয় আমি ভিন্ন আর কেউ জানে না আর যা একান্ত ভাবেই আমার নিজস্ব। উপলব্ধি করলাম যে যে মুহূর্তে তিনি দর্শন করেছেন আমাকে আমার অন্তর বাহির সবই হয়েছে তাঁব সম্পূর্ণ জানা। যে কেউ আসুক না তাঁর নিকট মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে তার হৃদয় হবে অনাবৃত তাঁর নিকট। এখনও তোমার খাওয়া হয়নি ? জিজ্ঞাসা কবলেন মহর্ষি। তিনি বললেন তুমি ক্ষুধার্ত—আগে খাও পরে কথা হবে। আদেশ করলেন শিষ্যকে ডেকে ভোজ্য ও পানীয়েব জন্য। সত্যই ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম—তাঁব সামনে বসে গ্রহণ করলাম ভোজ্য। তিনি বর্ণনা করে চললেন আমাব অতীত জীবনের ঘটনাবলী নিখুঁত ভাবে—বল্‌তে বল্‌তে এসে পৌছিলেন অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথায়—যেন আলোচনাব সুত্রেই এসেছেন এ কথায়—কিন্তু বিশেষ করে এ বিষয় যে আমাব সম্পর্কেই প্রযোজ্যতা স্পষ্টভাবে না বললেও বুঝলাম তাঁর নির্দেশ। বল্‌লেন তিনি অনৈসর্গিক বা অলৌকিক বিষয়েব ওপর গুরুত্ব দেবে না কখনও—কারণ একবার সাধকের চিত্ত ঐ বিষয় সমূহ অধিকার করলে তার ক্রিয়া চলতে থাকবে —ভগবৎ লাভেব চেয়ে শক্তি প্রদর্শনের ওপর বেশী ঝোঁক হবে। অতীন্দ্রিয় দর্শন, শ্রবণ বা ঐ রূপ বিষয় আয়ত্ব করার কোন সার্থকতাই যখন নেই তখন ঐ সকল ব্যতীতই সচ্চিদানন্দ লাভ এবং দিব্যজ্ঞান সম্ভব। কোন কোন ব্যক্তির ধারণা হতে পারে যে অভ্যাস বা সাধনার দ্বারা ঐরূপ শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা যায় বা কোন নিগুঢ় শক্তির অধিকারী হওয়া যায় কিন্তু ইহা একেবারেই অলীক। কোন গুরু অলৌকিক শক্তি লাভের জন্য সাধনা করেন না কারণ তাঁর জীবনে তার কোন প্রয়োজনই নেই। আমাদের জীবনে আমরা বহু বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হই কিন্তু মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ঘটনা এই যে যিনি একমাত্র ঐ সকল অলৌকিক ঘটনা ঘটান বা আমাদের গোচরে আনেন তাঁকে অর্থাৎ সেই সর্বশক্তিমান সর্ব নিয়ন্তা পরম ব্রহ্মকে মানুষ উপলব্ধি করেনা। জীবন, মৃত্যু এবং

অন্যান্য পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর ওপরে কোন গুরুত্ব স্থাপন ক'রো না এমন কি ঐ সকল বিষয় বাস্তবে অনুভব করলেও তার ওপর একেবারেই গুরুত্ব দিও না—গুরুত্ব দেবে একমাত্র তাঁকে যিনি ঐ সকল বিষয় সংঘটন করান, যিনি ঐ সকল বিষয় অনুভব করান। প্রথম প্রথম এই উপলব্ধি আসা অসম্ভব মনে হবে পরে অভ্যাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে ফল লাভ হবে। বহুবৎসর ধরে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনিক অভ্যাসের দ্বারা উহা আয়ত্ব হবে এবং সিদ্ধি লাভ করবে। প্রথম প্রথম দৈনিক অন্তঃত সিকি ঘণ্টাকাল সংশয়হীন ভাবে সমগ্র চেতনা নিবদ্ধ করবে তাঁর ওপর যিনি সব দেখান যিনি সব করান—তবেই পাবে তাঁকে অন্তরে। মনে ভেবোনা তিনি কোন একটি বিশেষ স্থূল বস্তু যার ওপর অনায়াসেই তোমার চেতনা নিবদ্ধ করতে পার। যদিও তাঁকে পেতে বহুবছরের সাধনার প্রয়োজন তথাপি পূর্বোক্ত উপায়ে অভ্যাসের দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর প্রতি তোমার মনসংযোগের ফল বুঝতে পারবে, অনুভব করবে মনে নিবিড় শান্তি, হৃদয়ে শক্তি পাবে বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের। এখন হতে সাধন কালে তোমার সমগ্র জীবন-ধারা দৃশ্যমান জগতের ওপর বা উহা দর্শনের কাজে নিবদ্ধ না হয়ে স্থির নিবদ্ধ হোক একমাত্র সেই পরম কারুণিক পরম পিতার ওপর যিনিই একমাত্র দর্শন করেন।

শ্রীভগবানের উপদেশ তিন ঘণ্টা কাল শ্রবণ করলাম—সমগ্র জীবন দর্শনই আমার গেল বদলে—অধ্যাত্ম জগতে নুতন আলোর সন্ধান পেলাম—অলৌকিক শক্তিই যে ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়ক নয় উপলব্ধি করলাম সেই ক্ষণে। শ্রীভগবানের সান্নিধ্য কি পরিবর্তনই না নিয়ে আসে মানুষের জীবনে।

গুরুবাদ প্রসঙ্গে মহর্ষি বললেন গুরু তিনিই যিনি সর্বকালে সর্বসময়ে নিমজ্জিত থাকেন ভগবৎ সমুদ্রে যিনি সমগ্র সত্তায় সমস্ত চৈতন্যে ঈশ্বরময় এবং সেখানেই তিনি হয়েছেন লয়—তবেই তিনি হবেন ঈশ্বরের প্রতীক—ঈশ্বরই তখন বাণী উচ্চারণ করবেন তাঁর

মুখ দিয়ে। তিনি যখন হস্ত উত্তোলন করবেন তখন তা হতে ঝরে পড়বে ভগবানের করুণা নির্ঝর।"

অল্পকালের মধ্যেই তৃতীয় বারের মত দর্শন করেন হামফ্রি মহর্ষিকে। এবারও উপদেশ লাভ করেন তিনি শ্রীভগবানেব নিকট হতে। সরকারী কাজ ও আধ্যাত্মিক জীবনে বিরোধেব আশঙ্কাব কথা জানান হামফ্রি মহর্ষিকে এবং এ বিষয়ে তাঁব কর্তব্য সম্পর্কেও নির্দেশ চান তিনি। উত্তরে মহর্ষি তাঁকে কাজ এবং সাধনা দুইই চলতে পারে একথা জানান। হামফ্রি এব পর কয়েকবছর মাত্র চাকরি করেছিলেন। চাকবী জীবন অপেক্ষা অধ্যাত্ম জীবনের আকর্ষণ তাঁর নিকট বেশী বলে মনে হয় এবং তিনি চাকুবি হতে বিদায় নিয়ে রোমান ক্যাথ্যলিক সন্ন্যাসী হয়ে নিবিড় ভাবে প্রবেশ করেন অধ্যাত্ম জীবনে।

শিব প্রকাশম পিলাই

শিবপ্রকাশম পিলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক। সরকারী রাজস্ব বিভাগে চাকুরী ব্যপদেশে আসেন তিনি দক্ষিণ আরকট জেলায় ১৯০২ সালে এবং দু'বছর পবে তিরুভান্নমালয়ে ঐ কাজে নিযুক্ত হ'ন। তিরুভান্নমালয়ে এসেই শোনেন তিনি অরুণাচল পর্বতোপরের নবীন সাধকের কথা। আগ্রহ নিয়ে দেখতে যান তাঁকে এবং প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হ'ন তাঁর প্রতি। তারপর অবসর পেলেই যেতেন তিনি বিরূপাক্ষ গুহায় শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে —অনুপ্রেরণা লাভ করতেন তাঁর উপদেশে—অসীম ভক্তি ও প্রীতিতে লুটিয়ে পড়তেন শ্রীভগবানের চরণে। চৌদ্দটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তিনি শ্রীভগবানকে। সে সময় মৌনব্রতী থাকায় ঐ সকল প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন মহর্ষি।

প্রঃ—আমি কে ? মোক্ষ লাভের উপায় কি ?

উঃ—"আমি কে"—অবিরাম অন্তর্মুখীন এই জিজ্ঞাসা দ্বারা নিজেকে জানতে পারবে এবং তাতেই—মোক্ষ লাভ হবে।

প্রঃ—আমি কে ?

উঃ—আসল আমি বা পাকা আমি অর্থাৎ আত্মন্—দেহ নহে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটি নহে, যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায় তাহার কোনটী নহে, যে সকল ইন্দ্রিয় কার্য করে তাহার কোনটী নহে, প্রাণ বা মন নহে, এমন কি গভীর নিদ্রাবস্থায় যখন ইন্দ্রিয় সকল কার্যকরী থাকে না—সে অবস্থাও নহে।

প্রঃ—যদি 'আমি' এই সকল অবস্থার একটীও নই তবে 'আমি' কে ?

উঃ—নেতি নেতি বা আমি ইহা নই, আমি ইহা নই এই বলে ঐ সকলের প্রত্যেকটী নস্যাৎ করতে হবে—তারপর যা থাক্‌বে তাহাই 'আমি' এবং তাহাই চৈতন্য।

প্রঃ—এইরূপ চৈতন্যের স্বরূপ কি ?

উঃ—ইহা সৎ-চিৎ-আনন্দ, ইহাতে অহং চিন্তার স্থান একেবারেই নেই, ইহাই আত্মন এবং একমাত্র বস্তু যাহার বিনাশ নাই যাহা শাশ্বত। যদি জগৎ, জীব, এবং ঈশ্বরকে পৃথক সত্তা হিসাবে দেখা যায় তা'হলে তা মুক্তাতে রৌপ্য দর্শনের ন্যায় অলীক হবে ; জগৎ, জীব এবং ঈশ্বর—শিবস্বরূপ বা আত্ম স্বরূপ।

প্রঃ—শিব স্বরূপের উপলব্ধি কি ভাবে হবে ?

উঃ—যখন দৃশ্যমান জগত বিলুপ্ত হয় তখন দর্শনকারী বা দর্শনীয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

প্রঃ—বাহ্য জগতের বস্তু সমূহের দর্শন এবং শিব স্বরূপের উপলব্ধি কি এক সঙ্গে হতে পারে না ?

উঃ—না, কারণ দর্শনকারী এবং দর্শিত বস্তুকে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হবে। যতক্ষণ না সর্প দর্শন হতে মুক্তি পাওয়া যায়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত আসল রজ্জু দর্শন হবে না।

প্রঃ—দৃশ্যমান জগত কখন বিলুপ্ত হবে ?

উঃ—মন, যাহা সমুদয় চিন্তা ও কার্য্যের কারণ, যদি বিলুপ্ত হয় তাহলে বাহ্য জগতও বিলুপ্ত হবে।

প্রঃ—মনের স্বরূপ কি ?

উঃ—মন চিন্তার সমষ্টী মাত্র—শক্তি এবং তেজ হিসাবেও ইহার প্রকাশ, ইহাই জগতরূপে প্রকাশ পায়। মন যখন আত্মায় সমাহিত হয় তখন আত্মা বা ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যখন মন বিক্ষিপ্ত হয় তখন জগতরূপ প্রকাশ পায় এবং আত্ম উপলব্ধি হয় না।

প্রঃ—মনের বিলোপ কি উপায়ে ঘটতে পারে ?

উঃ—নিরন্তর "আমি কে ?" এই জিজ্ঞাসা বা বিচার দ্বারা। যদিও এই বিচার একটী মানসিক প্রক্রিয়া তথাপি ইহা নিজের এবং অন্য সকল প্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার বিনাশ সাধন করে। যে বংশ দণ্ড দ্বারা চিতা খোঁচান হয় তাহা যেমন শব এবং চিতা দাহের পর নিজেও ভষ্মীভূত হয় উহাও তদ্রূপ। কেবল মাত্র এই বিচার দ্বারা আত্মোপলব্ধি হয়, অহং চিন্তা দূর হয়। শ্বাস প্রশ্বাস এবং অন্যান্য প্রাণ কার্য্যও দমিত হয়। যা কিছু কর, আমি আমার—এ ভাব মনে আসতে দেবে না—আমি করছি একথা মনে করবে না। অহং ভাব ত্যাগ পূর্বক আত্ম সমাহিত হওয়ার নামই ভক্তি।

প্রঃ—মনকে নিবৃত্ত করার কি অন্য কোন পথ নেই ?

উঃ—আত্মবিচার ভিন্ন অন্য কোন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নেই। যদি মনকে অন্য পদ্ধতি প্রয়োগে নিবৃত্ত করা হয় তা'হলে তাহা অল্প সময়ের জন্য দমিত থাকে মাত্র এবং তারপর আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে ও নিজের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে।

প্রঃ—কিন্তু কখন আমাদের সমুদয় কামনা বাসনার নিবৃত্তি ঘটবে ?

উঃ—আত্মার গভীরে যতই প্রবেশ করবে, ততই ঐ সকল কামনা বাসনার নিবৃত্তি ঘটতে থাকবে এবং পরিশেষে পূর্ণ নিবৃত্তি হবে।

প্রঃ—জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত ঐ সমুদয় বাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটা কি সম্ভব ?

উঃ—ঐরূপ সন্দেহের কণাও মনে স্থান দিও না—দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে আত্মার গভীরে অবগাহন করো। যদি মনকে নিরন্তর এই বিচার দ্বারা আত্মায় নিবিষ্ট করতে পার তাহলে পরিশেষে উহা আত্মায় বিলীন হবে। কোন সন্দেহকে মনে বাড়তে দিও না—জানতে চেষ্টা কর যার সন্দেহ জেগেছে সে কে ?

প্রঃ—এই বিচার কতদিন করতে হবে ?

উঃ—যতদিন পর্য্যন্ত তোমার মনে কিছুমাত্র চিন্তা উদয় হবার সম্ভাবনা থাকবে ততদিন বিচারের দ্বারা মনকে নিবৃত্ত করতে হবে। শত্রু যতদিন মনরূপ দুর্গ দখল করে থাকবে ততদিনই তারা আক্রমণ করতে থাকবে। প্রত্যেক শত্রু যেমন মাথা চাড়া দেবে তেমনই যদি তাকে শেষ করতে পার তাহলে পরিণামে দুর্গ তোমার দখলে আসবে। চিন্তারূপ শত্রু মাথা তুললেই তাকে বিচার দ্বারা প্রতি-নিবৃত্ত কর। মূলে চিন্তাকে নাশ করার নামই বৈরাগ্য। সুতরাং আত্মোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বিচারের প্রয়োজন আছে। সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে অবিরাম এবং অবিচ্ছেদ আত্মচিন্তা।

প্রঃ—এই জগতে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা কি ঈশ্বর ইচ্ছার পরিণতি নয় ? যদি তাহাই হয় তাহলে ঈশ্বর কেন ঐরূপ ইচ্ছা করেন ?

উঃ—ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনি কোন কার্য্যের দ্বারা বাধ্য নন্। পৃথিবীর কার্য্যাবলী তাঁ'র উপর ক্রিয়া করে না। সূর্য্যের উদাহরণ দেখ ; কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ব্যতীতই সূর্য্য উদয় হয় কিন্তু যে মুহূর্তে সূর্য্য উদয় হয় সেই মুহূর্তে জগতে নানারূপ ক্রিয়া ঘটতে থাকে। সূর্য্য কিরণে—পদ্ম কোরক বিকশিত হয়, জল বাষ্পে পরিণত হয়, প্রত্যেক জীবিত প্রাণী কর্মচঞ্চল হয়, আতসী কাঁচ ধরলে অগ্নি উৎপাদন করে—কিন্তু ঐরূপ কর্ম সমূহের দ্বারা সূর্য্যের কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না—সে তার স্বভাব অনুযায়ী

কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কাজ করে এবং ঐ সকল কাজের সাক্ষী মাত্র থাকে ; ঈশ্বরের বেলায়ও ঠিক সেরূপ। আবার ইথার অথবা মহাশূন্যের কথা চিন্তা কর; মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু সবই ইহার ভিতরে আছে, এবং ইহার মধ্যেই তা'দের নিজ নিজ পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু ইহারা কেহই ইথার বা মহাশূন্যের কোন পরিবর্তন ঘটায় না; ঈশ্বরের বেলায় ও ঠিক সেরূপ। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং প্রতিগ্রহণ ও ত্রাণ প্রভৃতি যে সকল কর্মে জীব আবদ্ধ—সেই সকল বিষয়ে ঈশ্বরের কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নাই। জীব ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী নিজ কৃতকর্মানুসারে ফল ভোগ করে—দায়িত্ব জীবের, ভগবানের নহে—ভগবান জীবের কর্মের দ্বারা আবদ্ধ নন্।

১৯১০ সালে শিবপ্রকাশম পিলাইয়ের চাকুরী জীবন অসহনীয় এবং বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। চাকুরী পরিত্যাগ করেন তিনি। সঞ্চিত বিত্তে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাতে পারবেন বলে মনে হয় তাঁর। তিন বছর পরে আসে তাঁর জীবনে প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান। এই সময় তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু ঘটে। মনে সন্দেহ জাগে তাঁর চাকুরী পরিত্যাগ করার অর্থ কি সাংসারিক জীবন হতে অব্যাহতি লাভের জন্য—না ইহা কেবল যাহা কষ্টসাধ্য তাহার ত্যাগ ও যাহা সুখসাধ্য তাহার রক্ষণ মাত্র! শ্রীভগবানের নির্দেশ চান তিনি মৌন ধ্যানে এবং নির্দেশও পান তিনি স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে। আনন্দে আত্মহারা হ'ন পিলাই পথের সন্ধান লাভে—শ্রীভগবানের নির্দেশে সাধক জীবন যাপন করেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রগাঢ় নিষ্ঠায় এবং ইপ্সিত ফল লাভও করেন তিনি।

এচাম্মল

মণ্ডলকোলাথুরের লক্ষ্মী আম্মল সম্পন্ন ঘরের বধু এবং সঙ্গতিপন্ন পিতার কন্যা। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই জীবনে নেমে আসে তাঁর দুঃখের পশরা। প্রথমে স্বামী, তারপরে একমাত্র পুত্র

এবং শেষে একমাত্র কন্যাকে অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে হারিয়ে শোক সাগরে নিমজ্জিত হ'ন তিনি। জীবন দুর্বিসহ মনে হয় তাঁর, আলোক দীপ নির্বাপিত হয় চিরতরে—নেমে আসে ঘন অন্ধকার তাঁর জীবনে। কোন ভাষা, কোন সান্ত্বনারই স্থান নেই তাঁর এই গভীর শোকে। গৃহ, পরিবেশ দুঃসহ মনে হয় তাঁর—বেরিয়ে পড়েন তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে। গোকর্ণী—এবং অন্যান্য তীর্থস্থানে সান্তনা খুঁজে বেড়ান সাধু মহাত্মাদের কাছে কাছে কিন্তু কেউই তাঁর মন হতে পারেন না নামাতে দুঃখের পশরা।

ভগ্ন হতাশ মন নিয়ে ফিরে আসেন লক্ষ্মী আম্মল নিজ গ্রামে ১৯০৬ সালে। তাঁর এক আত্মীয় জানান তাঁকে অরুণাচলের মহান সাধকের কথা—বলেন তাঁকে সেই মহান ঋষির কৃপা লাভ করতে পারলে সান্তনা তিনি পাবেন হৃদয়ে। বেরিয়ে পড়েন লক্ষ্মী আম্মল সেই ক্ষণে তিরুভান্নমালয়ের পথে। পরিহার করেন অরুণাচলবাসী আত্মীয় স্বজন, সোজা ওঠেন পর্বতোপরে বিরূপাক্ষ আশ্রমে শ্রীভগবানের দর্শন মানসে। আশ্রম চত্বরে আসীন শ্রীভগবান স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন লক্ষ্মী আম্মলের দিকে, মৌনই থাকেন তিনি, বুঝে নেন্ তাঁর অন্তরের গভীর দুঃখ। অশ্রু সজল চোখে দণ্ডায়মান লক্ষ্মী আম্মল নির্বাক নিস্পন্দ—কয়েক দণ্ড অতিবাহিত হয় একই ভাবে—ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকেন তিনি অন্তরে শ্রীভগবানের স্নিগ্ধ করুণা নির্ঝর, দেহ মন জুড়িয়ে যায়, নিবিড় শান্তির পরশে ভরে ওঠে তাঁর সমগ্র হৃদয় মন, অবগাহন করেন তিনি জ্যোতিঃ প্রবাহে। সেই মুহূর্তে লক্ষ্মী আম্মল প্রতিজ্ঞা করেন মনে মনে শ্রীভগবানের সান্নিধ্য ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না—সেবাব্রত গ্রহণ করবেন জীবনে।

নতুন মানুষে পরিণত হ'ন লক্ষ্মী আম্মল—নতুন জীবন আরম্ভ হয় তাঁর। পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় কুটীর নির্মাণ করেন তিনি—দিনের পর দিন পর্বতোপরে আশ্রমে আসেন শ্রীভগবান

কাছে—ব্যথায় আর ভেঙে পড়েন না, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আদরের ছেলে মেয়েদের কথা এখন বলতে পারেন তিনি—শ্রীভগবানের অপার কৃপা অনুভব করেন সর্ব সময় অন্তরে, ব্যথাতুর জীবনে উদ্ভাসিত হয় পরমেশ্বরের করুণা ঘন রূপ মাধুর্য্য।

লক্ষ্মী আম্মল পরিচিত হ'ন এচাম্মল নামে আশ্রমে। দিনের পর দিন আশ্রমবাসী সকলের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করেন তিনি তাঁর কুটীরে, আহার্য্য নিয়ে ওঠেন বিরূপাক্ষ গুহায়—সবাইকে খাইয়ে তবে প্রসাদ গ্রহণ করেন তিনি। যা কিছু অর্থ তাঁর পিতা এবং তাঁর মৃত্যুর পর ভ্রাতা পাঠান—সবই ব্যয় করেন তিনি আশ্রম বাসীদের সেবায়। তাঁর কুটীরের দ্বার থাকে অবারিত শ্রীভগবানের ভক্ত ও শিষ্য জনের তরে।

শ্রীভগবানের অনুমতি নিয়ে সেলাম্মলকে গ্রহণ করলেন পালিতা কন্যা হিসাবে এচাম্মল। মানুষ করলেন তাকে, বিবাহ দিলেন তার—পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল সেলাম্মলের—আদর করে নাম রাখলেন তার রমণ—শ্রীভগবানের কৃপা দান বলে।

জগদীশ্বর এচাম্মলের অদৃষ্টে সংসারের সুখ লেখেন নি। বিনা মেঘে হয় বজ্রাঘাত—হঠাৎ টেলিগ্রামে সংবাদ আসে—সেলাম্মলের মৃত্যু হয়েছে। অসুখ বিসুখের কোন সংবাদ নেই হঠাৎ এই সংবাদ নিদারুণ শেলের মত বেঁধে এচাম্মলের প্রাণে—ছুটে যান তিনি শ্রীভগবানের কাছে, ছুড়ে দেন টেলিগ্রাম তাঁর দিকে। শ্রীভগবান পড়ে দেখেন সংবাদ—দুনয়নে তাঁর ধারা নামে এচাম্মলের শোকে।

সেলাম্মলের শেষকৃত্য সেরে শিশু রমণকে নিয়ে ফিরে আসেন এচাম্মল—বসিয়ে দেন তাকে শ্রীভগবানের কোলে—দু'নয়নে আবার ধারা নামে শ্রীভগবানের—অংশ নেন্ তিনি এচাম্মলের শোকের। এচাম্মল অনুভব করেন শান্তির পরশ।

উত্তর অঞ্চল থেকে এলেন এক শাস্ত্রী শ্রীভগবানের দর্শন মানসে। বিরূপাক্ষ গুহায় শ্রীভগবানের সঙ্গে তিনি আলাপনে রত—আহার্য্য নিয়ে উঠে এলেন এচাম্মল গতানুগতিক সব দিনেরই

মত, কিন্তু সেদিন খুবই উত্তেজিত অবস্থায়—সারা দেহ তাঁর ভয়ে কাঁপছে। কারণ জিজ্ঞাসায় জানান তিনি—ওপরে ওঠার সময় বিরূপাক্ষ গুহার নীচে অবস্থিত সদ্‌গুরু স্বামী আশ্রমের পাশ দিয়ে যখন আসছিলেন তখন দুজনকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছেন সেখানে—দু'জনের একজন স্বয়ং শ্রীভগবান এবং অন্য জন অপরিচিত এক আগন্তুক। তিনি ওপরে উঠতেই থাকেন—কয়েক ধাপ ওঠার পরই শুনতে পান—"এখানেই যখন আমি আছি তখন আর কেন ওপরে উঠ্‌ছ?" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফিরে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে পান না তিনি—সেজন্য ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসেছেন এখানে। শাস্ত্রী এচাম্মলের ভাগ্যকে হিংসা করেন, বলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সময় কৃপা করেছেন শ্রীভগবান এচাম্মলকে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে। ঐ কৃপা তাঁর ওপর বর্ষণের জন্যও তিনি কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীভগবান বলেন দিবা রাত্র তাঁর ধ্যান করায় সম্ভবত এচাম্মলের দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে।

সেবা ও সাধনায় আরও পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন এচাম্মল। জগৎ সংসার ভুলে যান তিনি শ্রীভগবানের নাম ধ্যানে। সাধু মহাত্মা শিষ্য ও ভক্ত জনের সেবায়ও পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। পৃথিবীর সুখ দুঃখের উর্ধে ভগবৎ রাজ্যে প্রবেশ করেন তিনি—নশ্বর সংসারের দুঃখ বেদনা আর তাঁকে স্পর্শ করে না—আত্ম উপলব্ধি করেন এচাম্মল—সচ্চিদানন্দ অব্যয় রূপ প্রকাশ হয় তাঁর নিকট। ১৯৪৫ সালে মরলীলা সংবরণ করে শান্তি ধামে মহাপ্রয়াণ করেন এচাম্মল—তাঁর অমর আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়।

রাঘবাচারিয়ার

সরকারী অফিসের কর্মচারী হিসাবে রাঘবাচারিয়ার এলেন তিরুভান্নমালয়ে। শ্রীভগবানের যোগ বিভূতির কথা শুনে আগ্রহ নিয়ে দেখতে গেলেন স্কন্দ আশ্রমে শ্রীভগবানকে। প্রথম দর্শনেই

আকর্ষণ অনুভব করেন তিনি শ্রীভগবানের এবং তার পর হতেই যাতায়াত সুরু করেন নিয়মিত ভাবেই। মনে বাসনা একান্ত ভাবে নিবেদন করবেন শ্রীভগবানকে তাঁর অন্তরের কথা কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যখনই তিনি যান তাঁর নিকট তখনই শ্রীভগবান থাকেন শিষ্য, ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ পরিবৃত হয়ে। সঙ্কোচ অনুভব করেন তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সবার সম্মুখে, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরেন দিনের পর দিন। একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন রাঘবাচারিয়ার—শ্রীভগবানকে নিম্নোক্ত তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেনই সেদিন—

১। ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য মহর্ষি তাঁকে নিভৃতে কয়েক মিনিট সময় দিতে পারেন কিনা ?

২। রাঘবাচারিয়ার নিজে থিয়সফিকাল সোসাইটীর সদস্য —ঐ সোসাইটী সম্পর্কে মহর্ষির অভিমত কি ?

৩। মহর্ষি অনুগ্রহ পূর্বক তাকে তাঁর প্রকৃত রূপ সন্দর্শন করাবেন কিনা ?

ঐ দিনের ঘটনা রাঘবাচারিয়ার সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন—

"যখন আমি মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি তখন প্রায় ত্রিশজন ভক্ত ও দর্শনার্থী তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ব্যতীত সকলেই স্থান ত্যাগ করলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেলাম এইভাবে—আমার নিকট এই ঘটনা আশ্চর্য বলেই মনে হ'ল।

তারপর মহর্ষি নিজ হতেই জিজ্ঞাসা করলেন আমার হাতের পুস্তকটি গীতা কিনা এবং আমি থিয়সফিকাল সোসাইটীর সদস্য কিনা ? আমার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই তিনি মন্তব্য প্রকাশ করলেন—থিয়সফিকাল সোসাইটী ভাল কাজই করছে। আমার জিজ্ঞাসার পূর্বেই তিনি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও জবাব এই ভাবে দিলেন। এখন আমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষায় রহিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা নির্বাক হয়েই বসে রইলাম মহর্ষির সম্মুখে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণে দেখি তাহা অসীম শূন্যে নিবদ্ধ। সাহস ভরে আস্তে আস্তে নিবেদন করলাম—অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের সত্যরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন আমিও তদ্রূপ আপনার প্রকৃত রূপ দর্শনের অভিলাষী।

বেদীর ওপরে মহর্ষি আসীন, তাঁর পাশে দেওয়ালে অঙ্কিত দক্ষিণামূর্তির পট। মহর্ষির উদাস নয়ন ঘুরে ফিরে নিবদ্ধ হ'ল আমার নয়নে—যে ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তিনি সাধারণতঃ ভক্ত অনুরক্তের প্রতি। আমিও অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁরই চোখে চোখ রেখে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তাঁর দেহ ও দক্ষিণা মূর্তি—চারিদিক অসীম শূন্যতায় ভরে গেল—শূন্য মহাশূন্য, জাগতিক পদার্থের কোন চিহ্ন রহিল না কোথাও ·····আস্তে আস্তে সাদা মেঘের আস্তরণে প্রকাশ পেল মহর্ষির ও দক্ষিণামূর্তির আকৃতির বহিঃরেখা—ক্রমে স্পষ্ট হতে আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠ্‌ল তাঁদের চেহারা—চোখ, মুখ, নাক ও অন্যান্য অবয়ব বহ্নি শিখায় জ্বল জ্বল করতে লাগ্‌ল, সেই সঙ্গে বর্ধিত হতে থাক্‌ল তাঁর কলেবর এবং প্রজ্বলিত শিখার তেজে তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল।

অপূর্ব দর্শন লাভ করলাম আমি—ভক্তিতে, ভয়ে, বিস্ময়ে ও আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করলাম—শ্রীভগবানের নিরবয়ব অসীম অনন্ত রূপের উপলব্ধি করলাম। এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, চক্ষু উন্মিলন করে দেখি সবই স্বাভাবিক, মহর্ষি চেয়ে আছেন অসীম অনন্ত শূন্যের পানে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম শ্রীভগবান ও দক্ষিণামূর্তিকে—গভীর অনুভূতি বোধ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম।

একমাস পরের কথা—একাকী দাঁড়িয়ে ছিলেন মহর্ষি স্কন্দ আশ্রমের সামনে, নিকটে পৌঁছে তাঁর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত করে নিবেদন করলাম আমার সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে। শুনে মৌনই রইলেন কিছুক্ষণ, পরে আস্তে আস্তে বললেন আমাকে—
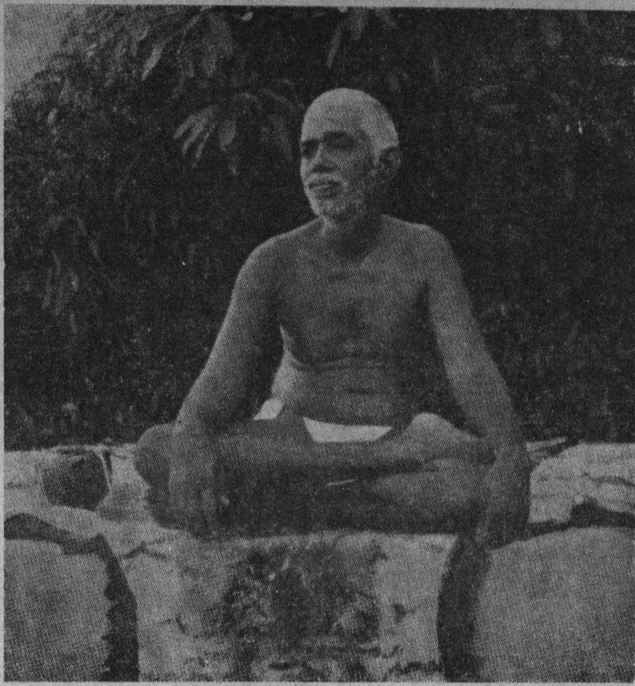
যোগাসনে শ্রীভগবান

"তুমি জানতে চেয়েছিলে আমার স্বরূপ—তুমি দেখেছ আমার অন্তর্ধান, তুমি জেনেছ আমি আকৃতি শূন্য নিরবয়ব—তোমার দর্শন সত্য স্বরূপ—পরের দৃশ্যাবলী ভগবদ্ গীতা অধ্যয়ন জনিত তোমার অভিজ্ঞতা হতে হয়ত হয়েছে উদ্ভূত।" উপদেশ দিলেন তিনি—"নিরন্তর অনুসন্ধান কর—আমি কে?—উক্ত দর্শনকারী বা চিন্তাকারী কে?—কোথায় তার আবাসস্থল—সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের রূপ তবেই হবে উদ্ঘাটিত।"

মায়ের অধ্যাত্ম জীবন ও মহাসমাধি

১৯০০ সালে পুত্র বেঙ্কটরমণকে বিরূপাক্ষ আশ্রম হতে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থকাম হয়ে ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে আসেন মাতা—মনে অনুভব করেন অপরিসীম বেদনা। ভগবানের অপার লীলা! একপুত্র সংসারত্যাগী, তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না একথা বুঝেই এসেছেন আল্‌গাম্মল্ তার উপর ফিরে আসার পরেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও হারান্ তিনি। শোকে অভিভূত হন আল্‌গাম্মল্—সান্তনা পান না কিছুতেই। তীর্থ করার বাসনা জাগে মনে—যদি তাতে হয় শোকের উপশম। আসেন বারাণসীধামের পুণ্যক্ষেত্রে—বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করে ও ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করে শান্তি অনুভব করেন হৃদয়ে। বারাণসীধাম হতে অন্যান্য তীর্থ পরিভ্রমণ করেন তিনি—ফেরার পথে তিরুভান্নমালয়ে পুত্রকে করেন দর্শন। আর অনুযোগ করেন না—সংসারে ফিরিয়ে পাবার জন্য অনুরোধও তিনি জানান না। শান্ত-সমাহিত হয়েছেন তিনি এখন, দর্শনেই তৃপ্তি পান—পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে যান মানমাদুরায়।

এই ভাবেই চলতে থাকে আল্‌গাম্মলের জীবনধারা। প্রায় প্রতি বৎসরই তীর্থ পরিভ্রমণ করেন তিনি। ১৯১৪ সালে দক্ষিণ ভারতের

সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র তিরুপতিতে ভেঙ্কটরমণ স্বামীর ছত্রে তীর্থ সেরে আসেন আবার তিরুভান্নমালয়ে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি এবং বাধ্য হয়ে অবস্থান করতে হয় সেখানে রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত। টাইফয়েড্ রোগের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়—অক্লান্ত ভাবে সেবা ও যত্ন করেন শ্রীভগবান তাঁর মায়ের। পুত্রের যত্ন ও শুশ্রুষায় অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করেন মাতা—রোগেরও হয় উপশম। মায়ের আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা জানান শ্রীভগবান পরম পিতার নিকট—

"হে অরুণাচল! হে দেবাদিদেব স্বরূপ পবিত্র পর্বতভূমি!
হে জন্ম জন্মান্তর রূপ পাপের ত্রাণ কর্তা!
তুমি করো আমার মাতৃদেবীকে রোগমুক্তা।
হে পরম ঈশ্বর! মৃত্যুকে করেছ তুমি নিধন,
হে অরুণাচলেশ্বর! প্রকাশ হও তুমি—
স্থাপন করো তোমার শ্রীচরণযুগলপদ্ম—
আমার জীবনদাত্রী মায়ের হৃদয় পদ্মে;
আশ্রয় দাও আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীকে,
প্রসারিত করো তোমার অভয় হস্ত তাঁর শিরে,
প্রবেশ লাভ করুক তোমার আলো তাঁর হৃদয়ে
সঞ্জীবনী অগ্নিশিখা রূপে—
মৃত্যুঞ্জয়ী করো তাঁকে।
মৃত্যুর স্বরূপ তো তোমার নাই অজানা!
হে অরুণাচলেশ্বর শিব! তোমার জ্ঞান বহ্নিতে,
তোমার অন্তরলোকে—করো আমার মাতৃদেবীকে আবৃত।
সকল বন্ধন দূর করে—দাও তাঁকে তোমার দিব্যজ্ঞান,
একীভূত হোন তিনি তোমার সাথে,
তবেই তো হবেন তিনি অগ্নিশুদ্ধা—
দাহের তো প্রয়োজন থাকবে না আর!
হে পরম পিতা! তোমাতেই যিনি একান্ত নির্ভর,

কর্মের নাগপাশ হতে মুক্তি দাও তাঁকে,
তুমি ভিন্ন তাঁর তো অন্য গতি নাই—
আশ্রয় দাও তাঁকে—করো তাঁকে মুক্ত।

শ্রীভগবানের সেবা ও প্রার্থনায় মাতার অন্তরে উদ্‌ভাষিত হয় ঐশ্বরিক সৌন্দর্য—পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোক রশ্মিতে বিশুদ্ধ হ'ন তিনি—অনুপ্রবেশ লাভ করেন আধ্যাত্মিক জগতে। শ্রীভগবানের মায়ের জন্য প্রার্থনা কেবলমাত্র তাঁর রোগ মুক্তির জন্যই নয়—তাঁর প্রার্থনা মায়ারূপ নাগপাশ হতে, বিকার হতে, বন্ধন হতে তাঁর মুক্তির উদ্দেশ্যে।

আরোগ্য লাভ করে ফিরে যান আল্‌গাম্মল মানমাছুরায় কিন্তু শ্রীভগবানের প্রার্থনা অরুণাচলেশ্বরের কর্ণে পেঁাছায়—সংসারে আর তাঁর মন বসে না। তিরুচাজীর বাড়ী বিক্রয় করে দেনা পরিশোধ করেন তিনি। এই সময় দেবর নেলিয়েপ্পিয়েরও মারা যান, সংসার চল্‌তে থাকে অভাব অনটনের মধ্যে। ১৯১৫ সালে কনিষ্ঠ পুত্র নাগসুন্দরমের স্ত্রীও মারা যান একটি শিশুপুত্র রেখে—কন্যা আলামেলু্ গ্রহণ করেন তাঁকে প্রতিপালনের জন্য। সাংসারিক দুঃখ বেদনায় আল্‌গাম্মল নির্বিকারই থাকেন—১৯১৬ সালে তিরুভান্নমালয়ে চলে আসেন তিনি। এচাম্মলের সঙ্গে বাস করেন তিনি কিছুকাল—পরে আশ্রমে যোগদান করেন স্থায়ীভাবে। এই সময় শ্রীভগবান অবস্থান করতেন বিরূপাক্ষ আশ্রমের ঠিক উপরে অবস্থিত স্কন্দ আশ্রমে।

আলগাম্মল্ নিয়োজিত করেন নিজেকে আশ্রমবাসীদের সেবায়—আহার্য প্রস্তুতের ভার নিলেন তিনি, সুরু হয় তাঁর নূতন জীবন—নিষ্কাম কর্ম এবং সাধনা চলতে থাকে একই সঙ্গে। পুত্র সাধনায় ঋদ্ধি সিদ্ধি লাভ করেছেন—সর্বজনমান্য হয়েছেন এজন্য গর্বও অনুভব করেন মাতা—অনুকম্পার চোখে দেখেন আর সকলকে। পুত্র নিলেন মাতার শিক্ষার ভার। অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকেন মাতাকে তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে—বল্‌লেন তাঁকে জগতের সব

স্ত্রীলোকই তাঁর মা—একমাত্র আলগাম্মল্‌ই তাঁর মা নন্‌। প্রথম প্রথম বিরক্ত হতেন তিনি পুত্রের ব্যবহারে, অভিমান হ'ত মনে, ক্রন্দন করতেন তিনি। আস্তে আস্তে গর্বভাব দূর হয় তাঁর, বোধ আসে, শ্রীভগবানের মা হওয়ায় যে কর্তৃত্ব ভাব তা হতে মুক্ত হ'ন তিনি, নিজেকে মনে ভাবেন দীনাতি দীন হিসাবে—পরিপূর্ণ ভাবে নিয়োগ করেন নিজকে শিষ্য ও ভক্তজনের সেবায় তাঁদের দাসীরূপে। চরিত্রে ফুটে ওঠে স্বর্গীয় সুষমা ও মাধুর্য্য—নির্মল পবিত্র জীবন লাভ করেন তিনি।

চার বৎসরের কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের জন্য ১৯২০ সাল হতেই তাঁর স্বাস্থ্য অবনতির পথে চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয় তাঁর অধ্যাত্ম জীবন—মৌন ধ্যানে কাটান তিনি দিবারাত্রের অধিকাংশ সময়। শ্রীভগবান নিলেন মাতার সেবার ভার—বসলেন এসে তাঁর শয্যাপার্শ্বে, দিবারাত্র জ্ঞান করেন না তিনি।

১৯২২ সালে বেহুলা নবমী তিথিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন আলগাম্মল্, শ্রীভগবান ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সেদিন উপবাস করে উপস্থিত থাকেন তাঁর শয্যা পাশে। দিনের শেষে রাত্রির আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আহার্য প্রস্তুত করতে বলেন মহর্ষি—ভক্তবৃন্দকে তা গ্রহণ করতেও নির্দেশ দেন কিন্তু নিজে থাকেন উপবাসী।

বেদ পাঠ ও রাম নাম করতে থাকেন ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতি দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে মাতার এবং তাঁর অন্তিম কাল ঘনিয়ে আসে। শ্রীভগবান শয্যা পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না মুহূর্তের জন্যও—দক্ষিণ হস্ত রাখেন তিনি মাতার বক্ষে এবং বাম হস্ত মস্তকে। মহা সমাধির জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকেন তিনি। রাত্রি ৮ টায় দেহপিঞ্জর হতে মুক্ত হয় তাঁর আত্মা—সঙ্গে সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে উঠে দাঁড়ান শ্রীভগবান—জানান সকলকে—পবিত্র নির্মল আত্মায়—কোন দোষ স্পর্শে

নাই—ইহা তাঁর মৃত্যু নয় ইহা পরমাত্মার সহিত তাঁর নিবিড় মিলন—সেজন্য সকলেই সেইক্ষণে আহার্য গ্রহণ করতে পারেন।

মায়ের মুক্তি লাভ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলেন তাঁর বাহ্যিক চেতনা ছিল না সত্য কিন্তু আভ্যন্তরিক পূর্ণ চেতনায় দর্শন করেন তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য—তাঁর অন্তরাত্মা সঞ্চয় করেন একের পর আরেক অভিজ্ঞতা—পুনর্জন্মের পরিবর্তে পূর্ণ মিলনের পথ প্রস্তুত হয় তাঁর এই ভাবে—অবশেষে আসে চরম মুক্তি—অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে প্রবেশ করেন তিনি জ্যোতির রাজ্যে অনাবিল শান্তির রাজ্যে চিরতরে।

মাতার ব্রহ্ম প্রাপ্তির পক্ষে শ্রীভগবানের ধ্যান ও প্রার্থনা হয় কার্যকরী—যদিও পালানীস্বামীর জন্য হয় না তা ফলপ্রসূ—পালানীস্বামীর অহমিকার হয় নি যে তখনও শেষ—অবশ্য নির্বাণ প্রাপ্ত না হলেও সুজন্ম লাভ তাঁর অবধারিত।

কোন ভক্ত বা অনুরক্ত শোকে মুহ্যমান হলে শ্রীভগবান সান্ত্বনা দিতেন এই বলে—যে মরণ হয় শুধু দেহেরই—এবং 'আমি দেহ' এই মায়া মরণকে দেয় বিয়োগান্ত রূপ। শ্রীভগবান শোকানুভব করেন না মায়ের মৃত্যুতে, ইহা তাঁর দেহরূপ আধার ত্যাগ মাত্র, তাঁর ধারণা মাতা সেই স্থানেই করছেন অবস্থান। ব্রহ্ম সঙ্গীত করেন শ্রীভগবান ও ভক্তবৃন্দ অবশিষ্ট রাত্রি।

মায়ের ব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না শ্রীভগবানের মনে কিন্তু ভক্ত ও অনুরক্ত জনের মনে প্রশ্ন জাগে স্ত্রী সাধকের দেহ ভস্মীভূত না করে সমাধিস্থ করা সঙ্গত কি না? প্রতিভাত হয় তাঁদের নিকট ১৯১৭ সালে শ্রীভগবান এই সম্পর্কে শ্রীগণপতি শাস্ত্রীর প্রশ্নাবলীর উত্তরে যে কথা বলেছিলেন তাহা—যথা, জ্ঞান এবং মুক্তি স্ত্রী পুরুষ ভেদে বিভিন্ন হয় না—সেজন্য স্ত্রীসাধকের দেহ ভস্মীভূত না করাই বিধেয়—তাঁদের দেহও ঈশ্বরের আবাস স্থল।

মাতার দেহ সমাধিস্থ হয় পবিত্র অরুণাচল পর্বতের দক্ষিণ পাদ-প্রান্তে—পালিতীর্থম পুষ্করিণী ও দক্ষিণা মূর্তি মণ্ডপের মধ্যবর্তী

স্থানে। মুক মৌন হয়ে নির্নিমেষ নয়নে দাঁড়িয়ে দেখেন শ্রীভগবান মাতার সমাধি। তিরুভান্নমালয় সহর হতে কাতারে কাতারে অগণিত মানব আসেন তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। বেদী নির্মিত হয় সমাধি স্থানের উপরে—পরে মন্দিরও গড়ে ওঠে তার ওপর এবং নামকরণ হয় তার "মাতৃভূতেশ্বর মন্দির" অর্থাৎ ঈশ্বর হয়েছেন এস্থানে মাতৃরূপে আবির্ভূত।

আশ্রম জীবনে মাতার আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই তাৎপর্য্য পূর্ণ। এসেছিলেন তিনি শক্তির আধার রূপে—এবং তাঁর মহা প্রয়াণে সেই শক্তির স্ফুরণ হয় বর্ধিত রূপে। জগতের মানবের মুক্তি সাধন ক্ষেত্রের বীজ রোপিত হয় তাঁর সমাধিক্ষেত্রে—ভবিষ্যৎ রমণাশ্রমের সূচনা হয় তাঁরই সমাধিকে কেন্দ্র করে।

শ্রীভগবানের পার্থিব জীবনে অনুজ—নাগসুন্দরম সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিরঞ্জনানন্দ স্বামী নামে হ'ন পরিচিত। সমাধি স্থানের নিকটে তিনি বাঁধেন এক পর্ণ কুটীর এবং বাস করতে থাকেন সেখানে। শ্রীভগবান স্কন্দ আশ্রমেই অবস্থান করেন সে সময় এবং প্রত্যহই আসেন পর্বত অবরোহন করে মায়ের সমাধিস্থানে। ছয় মাস পরের ঘটনা—একদিন পাদচারণে বাহির হয়েছেন শ্রীভগবান—শিষ্য ও ভক্ত জন সাথে—হঠাৎ অনুভব করেন সমাধি স্থানে উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত বিপুল আকর্ষণ, তৎক্ষণাৎ চলে আসেন শ্রীভগবান মায়ের সমাধি স্থানে—সেস্থানে বাস করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলেই অনুমিত হয় তাঁর। ভক্ত ও শিষ্যগণও নেমে আসেন পর্বতোপাদদেশে তাঁকে অনুসরণ করে—করেন তাঁরা জঙ্গল পরিস্কার, বাঁধেন কুটীর—স্থাপন করেন মহর্ষিকে সেই পর্ণ কুটীরে—তাঁর হৃদয় এবং আশ্রম দুয়ার দুইই থাকে দিবা রাত্র সর্ব সময়ই উন্মুক্ত দেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানবের তরে—বিশ্বের মানবের কল্যাণে অরুণাচলের পবিত্র ভূমিতে এইরূপেই হয় শ্রীরমণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীরমণাশ্রম

মাতার সমাধি পার্শ্বে একটী মাত্র পর্ণ কুটীরকে আশ্রয় করে যে আশ্রমের সূচনা হয় তাকেই কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে শ্রীরমণাশ্রম। এক সময় যা ছিল পার্বত্য জঙ্গলময় ভূমি তা আজ পরিণত হয়েছে আত্মোপলব্ধির আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম তপঃভূমি রূপে। তিরুভান্নমালয় সহর হতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীরমণাশ্রমের উত্তরে মহান অরুণাচল পর্বত, দক্ষিনে অধুনা নির্মিত তিরুভান্নমালয়-বাঙালোর সড়ক এবং পশ্চিমে প্রশস্ত পুস্করিণী। আশ্রমের সাধন ভবনটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা একটি বড় ঘর—ঘরের উত্তর পূর্ব দিকে শ্রীভগবানের আসন উচ্চ বেদীর ওপর—এখানেই দিবারাত্রের অধিকাংশ সময়ই তন্ময় হয়ে থাকেন মহর্ষি ধ্যান সমাধিতে—ভক্ত শিষ্য দর্শনার্থীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং উপদেশ বর্ষণ ও করেন এখানেই বসে—রাত্রে সামান্য দু'চার ঘণ্টা নিদ্রা যান ঐ একই আসনে। সাধন ভবনের সঙ্গে গড়ে উঠেছে অতিথিশালা পুরুষ ভক্তদের জন্য, ভোজনালয়, পোষ্ট আপিস, চিকিৎসালয়, গোশালা, ছোট ছোট কুটীর প্রভৃতি। গৃহীভক্তেরা শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে বাসের নিমিত্ত নির্মাণ করেছেন নিজ নিজ বাস ভবন। প্রধান সড়কের অপর পারে নির্মিত হয়েছে বাংলো বাড়ী, মোরভির রাজা নির্মাণ করেছেন ভবন—মহর্ষির দর্শন প্রার্থী বিশিষ্ট অতিথি ও রাজন্যবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত। পুস্করিণী ও পর্বতের মধ্যবর্তী পেলাকট্টু নামক স্থানে সাধু সন্তরা গুহাভ্যন্তরে ও বৃক্ষাদির তলদেশে কুটীরে সাধন ভজনে থাকেন ব্যাপৃত।

আশ্রম গঠনের সমস্ত ভারই বহন করেছেন স্বেচ্ছায় নিরঞ্জনানন্দ স্বামী এবং তিনিই আশ্রমের প্রথম সর্বাধিকারী। শ্রীভগবান আশ্রম গঠনের বা পরিচালনার কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেননি কোন দিনই—পার্থিব জীবনের কোন কিছুর সঙ্গেই রাখেননি তিনি সংস্পর্শ—তবে আশ্রমের নিয়ম কানুন যা সকলের সম্পর্কে

প্রযোজ্য তা স্বেচ্ছায় করেছেন তিনি নিজের সম্পর্কেও প্রয়োগ—এক তিল ব্যতিক্রম হতে দেন নি কোথাও কোন দিন।

সমবেত ভক্ত অতিথি ও দর্শনার্থীর জন্য আশ্রম ভোজনালয়ের দ্বার সদাই অবারিত—মহর্ষিও এসে বসেন সবার সঙ্গে আহারে—কোন বিশেষ ব্যবস্থা হতে দেন নি তাঁর নিজের জন্য—সকলে যা গ্রহণ করবেন তিনিও তাই খাবেন। কফি পরিবেশন হয় প্রাতঃরাশের সঙ্গে প্রতিদিন—কিন্তু সকলকে কফি পরিবেশন সম্ভব হয় নি কোন একদিন সেজন্য মহর্ষি আর গ্রহণ করেন নি কোন দিনই কফি—এই ছিল মহর্ষির নিয়ম। আশ্রম জীবনে তিনি এবং অন্য সকলে সমান। ঘড়ির কাঁটার মত চলে আশ্রমের প্রতিটী কাজ তার নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি—নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হয় সবাইকে পরিপূর্ণভাবে।

প্রত্যুষে ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে শয্যা ত্যাগ করেন মহর্ষি—সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসী সকলেই লিপ্ত হ'ন যে যার কাজে। মহর্ষি বসেন এসে নিজ আসনে প্রাতঃ স্নানের পর—বন্দনা করেন শিষ্যবৃন্দ তাঁকে ঘিরে—প্রশস্তি গান করেন তাঁরা অরুণাচলেশ্বরের—বেদ গানে হয় তার সমাপ্তি। সহর থেকেও আসেন ভক্ত শিষ্য অনুরক্ত ও দর্শনার্থীর দল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে—সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে মহর্ষিকে যোগ দেন সকলে প্রার্থনায়। ধ্যান গম্ভীর মূর্তি মহর্ষির, আঁখি নিমিলিত—স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্‌ভাষিত মুখমণ্ডল, অপূর্ব দর্শন—সেই সঙ্গে ভক্ত শিষ্যগণের ধ্যান সমাধি ও সকলের সমবেত অধ্যাত্ম শক্তিপ্রবাহ সৃজন করে স্বর্গীয় পরিবেশ—পৃথিবীর সুখ, দুঃখ, বেদনা, অনুভূতির বহু উর্ধে অসীম অনন্তে পরম সত্তার সহিত মিলন অনুভব করেন সবে নিজ নিজ সত্তার। বন্ধ হয় বেদ গান, লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানান সকলে শ্রীভগবানকে আর সেই সঙ্গে অনাদি অনন্ত পরম ব্রহ্মকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান শ্রীভগবান—সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী হ'ন ভক্ত অনুরক্তেরা। শেষ জীবনে কষ্ট করেই উঠে দাঁড়াতে হয় মহর্ষিকে, লাঠি ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে

চলেন তিনি—উত্তরের দরজা দিয়ে বাইরে আসেন—যাওয়ার পথে ভক্ত অনুরক্তদের প্রতি মৃদু হাস্যে চেয়ে দেখেন—সুন্দর জ্বল্‌জ্বলে চোখ ও সুষমায় ভরা মুখ খানি তাঁর, পৃথিবীর মানবের জন্য অনুকম্পা ও করুণা ঝরে পড়ে তা হতে, কঠোরমনা মানুষও আত্মহারা হন তাঁর হাসির মাধুর্য্যে—হৃদয় মন আলোকিত হয়ে ওঠে এক নিমিষে।

প্রার্থনা শেষে প্রদক্ষিণ করেন মহর্ষি প্রত্যহ অরুণাচল গিরি—তবে পরিণত বয়সে বার্ধক্য হেতু এবং শিষ্য ভক্ত অনুরক্তজন তাঁর দর্শন মানসে এসে বিফল মনোরথ না হ'ন এই কারণে ব্যতিক্রম করেন ঐ ব্যবস্থার। দৈহিক প্রয়োজনানুসারে প্রাতঃ ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসেন তিনি আশ্রম ভবনে ৮টার মধ্যে। বেলা ৯টার মধ্যেই আশ্রম গৃহ পূর্ণ হয় মুমুক্ষু, ভক্ত, শিষ্য, দর্শনার্থীর সমাগমে। সর্বদেশের সর্বশ্রেণীর লোক আছেন আগতদের মধ্যে—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানব, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুমুক্ষু দর্শনার্থী, সাধু সন্ত মহাত্মা, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, সমাজের উচ্চস্তরের লোক—রাজা, মহারাজা, সাধারণ মানুষ—চাষী মজুর—শিক্ষিতা আধুনিকা মহিলা, গৃহস্থ কন্যা বধূ ও কৃষক-পত্নী বসেছেন সবাই মহর্ষির সম্মুখে ভূমি আসনে—সকলেই সমান মহর্ষির নিকট—তাঁর কাছে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ কোন ভেদ নেই। কোন পৃথক ব্যবস্থা নেই কারও জন্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও আসে নিয়মিত মহর্ষির দর্শনে। তাদের দেখলে খুসীই হ'ন মহর্ষি। কেউ আসেন সাধন পথের সন্ধান জানতে, কেউ যাচিঞা করেন অধ্যাত্ম পথে মহর্ষির নির্দেশ, কেউ জানান সুখ, দুঃখ, বেদনা—কারো বা নেই কোন নিবেদন—মহর্ষির সান্নিধ্যই কেবল তাদের কাম্য—তাঁর নিকটে বসে অনুভব করেন তারা অসীম শান্তি—তাঁর মৌন দৃষ্টিতে শক্তি অনুভব করেন তারা হৃদয়ে—কেউ বা তাঁর জ্যোতিঃ প্রবাহে অবগাহন করে সাধনায় করেন সিদ্ধিলাভ। অনেকের নিকট মহর্ষির মৌন বাণীই অধিক কাম্য; নীরবতার

মধ্যে অনুভব করেন তারা মহষির অধ্যাত্ম শক্তি প্রবাহ—অনুসিক্ত করেন তারা তাদের সমগ্র সত্তা সেই প্রবাহে—মৃত্যুঞ্জয়ী হ'ন তারা।

চেয়ে দেখেন মহর্ষি ভক্ত ও শিষ্যের প্রতি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে—তার অন্তর বাহির স্বচ্ছ হয়ে ওঠে দিবালোকের ন্যায় তাঁর নিকট—বুঝে নেন সাধনায় কতদূর হয়েছে সে অগ্রসর—কখনও কখনও দৃঢ় নিবদ্ধ করেন দৃষ্টি ভক্তের প্রতি—তাঁ হতে অনুপ্রবেশ লাভ করে জ্যোতিঃ তরঙ্গ ভক্তের অন্তরে—সেই তরঙ্গ স্পর্শে এক নিমেষে অনুভূতি লাভ করেন ভক্ত—নিখিল বিশ্বচরাচর এক হয় তার নিকট, উপলব্ধি হয় চরম সত্য—জীবন দর্শনও তার যায় বদলে।

ভক্ত, শিষ্য ও দর্শনার্থী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন মহর্ষিকে—উত্তরও দেন শ্রীভগবান সঙ্গে সঙ্গে। এইসব কথোপকথনের মধ্য দিয়েই শ্রীভগবানের জীবনবেদ হয় পরিস্ফুট—তাঁর উপদেশাবলী সর্বদেশের সর্বকালের মানবের মুক্তি পথের দিশারী হয়।

মহর্ষি বলেন সাধন জীবনে গুরু বা ঋষির সান্নিধ্যে সহজ ও নিয়মিত হয় শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া। সাধকের সমাধিকালে কুম্ভক বা শ্বাস ক্রিয়া হয় ছন্দময়—তারই সঙ্গে ছন্দময় হয় ভক্তের অনুভূতি —তার মন ও চিন্তাধারা হয় সাধকের চিন্তাধারার অভিমুখী বিপরীতগামী মন হয় শান্ত—মনের গভীরে প্রবেশপথ পায় সে।

শ্রীভগবানের বহু শিষ্য ও ভক্ত নিজ অভিজ্ঞতা হতে বর্ণনা করেছেন এই প্রক্রিয়ার—তারা বলেন নির্জন স্থান, গুহা, পর্বত, বন, নদীতীর, মঠ ও মন্দিরে মন নিবিষ্ট করতে অকৃতকার্য হয়ে অবশেষে মহর্ষির সান্নিধ্যে বসে তাদের মনের চিন্তা হয়েছে দূর—মহর্ষির করুণারশ্মি অনুপ্রবেশ করেছে তাদের সত্তায়—এসেছে নিবিষ্টতা, উপলব্ধি করেছে তারা চিন্ময় সত্তা। তাঁর নিকটে মন হয় অন্তর্মুখী--পরে তাই দাঁড়ায় অভ্যাসে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে হয় তা সহায়ক।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনায় জনৈক ভক্ত বলেন—"শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে থাকার কিছুকাল পর হতেই মহর্ষি হতে নির্গত জ্ঞানরশ্মি ধীরে ধীরে অদৃশ্যভাবে কার্য করে আমার অন্তরে। কথাই বলতে চেয়েছিলাম আমি প্রথমে তাঁর সঙ্গে—কিন্তু ক্রমে বোধ এল কথা অবান্তর এখানে—হতাশ হলাম আমার প্রশ্ন সমূহের অসারতা উপলব্ধি করে। পরে সহজাত জ্ঞানই দেখাল প্রকৃত পথের সন্ধান, ধীরে ধীরে শ্রীভগবানকে ঘিরে যে মৌনতা রয়েছে তার ভাষা শ্রবণ করতে আরম্ভ করলাম আমি—বোধ এল কি গভীব মনঃসংযোগ থাকলে দমিত হয় চিন্তারাশি—খুলে যায় মনের কপাট, গ্রহণক্ষম হয়—মহর্ষি হতে নির্গত অন্তর্দর্শী স্পন্দন সমূহ—উচ্চতম ভাবে অনুপ্রাণিত হয় ভক্তজন। উপলব্ধি কবলাম নিজের গ্রহণক্ষমতার ওপর নির্ভর কবে—কি পরিমাণ চৈতন্য বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুসিক্ত করবে আমাব মনকে, অনুপ্রবেশ লাভ করবে আমাব গভীরতম অন্তবে। অবশেষে আসে আমার জীবনের স্মরণীয় দিন—চেয়েছিলাম মহর্ষির প্রসাবিত নয়নের দিকে হঠাৎ বোধ এল শ্রীভগবানের জীবন এই পার্থিব জগতের নয়—নিখিল বিশ্ব ছাড়িয়ে তা হয়েছে বহুদূরে প্রসারিত—সব মিলিয়ে সে এক অখণ্ড সত্তা—ধীরে ধীরে আমারও অজ্ঞানতার খোলস খুলে মিলিয়ে যায়—অখণ্ডতা অনুভব কবি পবম সত্তার সহিত—এই বোধ প্রকাশের কোন পার্থিব ভাষা আমার নাই।"

দিবাবাত্র যে কোন সময় যে কেউ মহর্ষির সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারেন—এর জন্য প্রয়োজন হয় না পরিচয় পত্রের বা তার আগমনবার্তা ঘোষনাও করতে হয় না। বেলা ১১টা পর্যন্ত চলতে থাকে ধ্যান, ধারণা, উপদেশ প্রভৃতি—মহর্ষি থাকেন অধিকাংশ সময়ই ভাবমুখে—দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তাঁর অসীম অনন্ত মহাকাশে, মধ্যে মধ্যে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হ'ন তিনি। বেলা ১১টা হতে ১২টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়—আশ্রমবাসী এবং অতিথি অভ্যাগত সবার সঙ্গে একসঙ্গেই বসেন মহর্ষি ভোজনে।

আহারের সময় সবার প্রতিই লক্ষ্য রাখেন তিনি। এর পরে বিশ্রাম গ্রহণ করেন শ্রীভগবান। আবার সুরু হয় দর্শনার্থীর আগমন ৩টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বিকালে আসে ডাকের চিঠিপত্রও সংবাদপত্র—চোখ বুলিয়ে দেখেন মহর্ষি—পূর্বদিনের চিঠির উত্তর লেখা হয় আশ্রম আপিসে এবং দেখিয়ে নেওয়া হয় মহর্ষিকে, যদি তিনি কোন অংশ বদল করতে চান তার সম্পর্কে নির্দেশও দেন তিনি—যদিও দৈবাৎ সংশোধনের হয় প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর বহিরাগত দর্শনপ্রার্থীরা বিদায় নেন—আশ্রমিক ও বহিরাগত ভক্ত শিষ্যরা উপাসনা ধ্যান ধারণা করেন মহর্ষির সান্নিধ্যে বসে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। যাঁরা শ্রীভগবান প্রদর্শিত পথে—অর্থাৎ আত্ম-বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে চান—মহর্ষির সম্মুখে বসে ঐ পথে সাধনা হয় তাদের পক্ষে বিশেষ সহজ সাধ্য—তাঁর চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া "আমি কে?" এই প্রশ্নে থাকে ভরপুর। রাত্রের আহারের পর সাধারণতঃ আশ্রমবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের সম্মুখে বসে ঋভূ গীতা, কৈবল্য নবনীতম প্রভৃতি পাঠ করেন—মধ্যে মধ্যে মহর্ষি বুঝিয়ে দেন প্রাঞ্জল ভাবে শাস্ত্রোক্ত বিষয় সমূহ। এইভাবে দু'তিন ঘণ্টা চলতে থাকে পাঠ আলোচনা প্রভৃতি—আবার কখনও কখনও সারারাত্রিই চলে পাঠাদি। শ্রীভগবানের মতে ঋভূগীতা পাঠে আসে সমাধি ভাব—আর পাঠান্তে মনের ওপর রাখে তার ছাপ—মহর্ষির উপদেশ হয় সহজবোধ্য—প্রবেশ করে তা অবচেতনায় এবং পরিণামে হয় তা বিশেষ ফলপ্রদ।

আশ্রমবাসী জীবজন্তুদের প্রতিও সমান ব্যবহার ছিল মহর্ষির। গাভী লক্ষ্মী, কুকুর কমলা ও চীনা কারুপ্পানকে (ছোট কাল কুকুর) ভক্তদের সঙ্গে সমপর্যায়ে দেখা হ'ত। তাদের আহার্য দেওয়া হত ভক্তদের আহারের পূর্বে। মহর্ষির মতে তাদের অন্তঃকরণ অতি উচ্চস্তরের ছিল এবং সাধনায়ও ছিল তারা অগ্রসর। জীবজন্তুরা সকলে নির্ভয়েই আসত মহর্ষির নিকট—পাহাড়ের ওপর হতে বানরের দল, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি এসে বসত মহর্ষির

কাছে—আহার্য গ্রহণ করত তাঁর হাত থেকে। আশ্রম চত্বরে হিংস্র সাপও হিংসা ভূলে নির্ভয়ে করত বিচরণ এবং মহর্ষির নির্দেশে অনিষ্টও কেউ করত না তাদের।

আশ্রমের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ, ঈশ্বরে সমর্পিত মন মানবের সমাগম, ভক্ত শিষ্যগণের সাধনা এবং সর্বোপরি শ্রীভগবানের কায়িক এবং এমনকি তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগের পরে আত্মিক উপস্থিতিতে সর্বকালে সর্বদেশের মানবের তীর্থক্ষেত্রে হয়েছে পরিণত শ্রীরমণাশ্রম।

আশ্রম জীবনের শিষ্য ও ভক্তজন

১৯২২ সালে আশ্রম গঠনেব সময় হতে ১৯৫০ সালে মহাপ্রয়ান পর্যন্ত সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল মহর্ষির সাধনা ও ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসেছে তিরুভান্নমালয়ে শ্রীরমণাশ্রমে পৃথিবীব সর্বদেশের অগণিত নরনারী—লাভ কবেছে শ্রীভগবানের করুণা কৃপা—অনুপ্রেরণা পেয়েছে অধ্যাত্ম জীবন পথে। মহর্ষি নির্দেশিত সাধন পথে অসংখ্য শিষ্য ও ভক্ত অধ্যাত্ম জগতের উচ্চতম শিখরে করেছে আরোহণ। গৃহী, ভক্ত ও অনুরক্তজন শ্রীভগবানের করুণারশ্মি স্পর্শে সংসার আশ্রমেই পেয়েছে নিবিড় শান্তি—লাভ করেছে ভগবৎ কৃপা। শ্রীবমণাশ্রমে পৌছিবার সৌভাগ্য যাদের হয়নি সেই সকল নিবিষ্ট-মনা শিষ্য এবং ভক্তও লাভ করেছে দূর হতে শ্রীভগবানের নিকট হতে অনুপ্রেরণা, তাঁর উপদেশ ও সাধন পথের ইঙ্গিত হয়েছে তাদের পক্ষে আশ্চর্যরূপে কার্যকরী।

চরম সত্যলাভে হয় প্রয়োজন নিজের আন্তরিক প্রচেষ্টা কিন্তু মহর্ষির নির্দেশ ও পথ-প্রদর্শন সহজ করে তাদের যাত্রাপথ—তাঁর সম্মুখে সহজেই হয় চিন্তাধারার পরিবর্তন—ভগবৎ চৈতন্যে অনুপ্রবেশ হয় সম্ভব। আশ্রমের আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা মনকে সংযত

ও একাগ্র করে এবং সাহায্য করে গভীরে করতে অবগাহন। আত্মানুসন্ধানী এতগুলি মানবের সমষ্টীগত চিন্তাধারা যে আবহাওয়ার সৃষ্টিকরে তাতে অল্লায়াসেই মন হয় অন্তর্মূখী আর তা হয় অনুকূল অন্তর্দর্শনের। যে সমুদয় প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান কিছুকাল পূর্বে বুদ্ধিতে ছিল না সম্ভব—মহর্ষির সম্মুখে অল্লায়াসেই তার স্বরূপ হয় উদ্ঘাটিত।

সাধনার প্রত্যেক স্তরে গুরু কৃপা ও আশীর্বাদের হয় একান্ত প্রয়োজন এবং মহর্ষির নিকট তা হয় সহজ লভ্য। তাঁর সান্নিধ্যে সাধনায় ভক্ত সহজেই লাভ করে অনুভূতি—অবিশ্বাসী ফিরে পায় বিশ্বাস—নাস্তিক হয় আস্তিক—অধ্যাত্ম জগতে ইতিহাস রচনা করে তারা, মেনে নেয় তা শ্রীভগবানেরই করুণা দান বলে—তাদের জীবন কথায় পরিস্ফুট হয় শ্রীভগবানের অপার করুণা কণা, অপরিমেয় সাধন ফল ও ঐশী শক্তি।

পল ব্রান্টন

পল ব্রান্টন একজন খ্যাতনামা ইংরাজ সাংবাদিক। ঝোঁক ছিল তাঁর যাদুবিদ্যা, সম্মোহিনী বিদ্যা, অলৌকিক দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন, যোগরহস্য, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতির ওপর অতিমাত্রায়। ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং অনুশীলনের জন্য পাড়ি দেন তিনি ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ সমূহে।

ভারতবর্ষে পৌঁছেই বেরিয়ে পড়েন তিনি ঐ সকলের খোঁজে সহরে, গ্রামে, পর্বতে, অরণ্যে—সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কোন স্থানই বাদ পড়েনি তাঁর অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে। সাধু, সন্ন্যাসী, ঋষি, মহাত্মা, সাধক, জ্যোতিষী ও ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করেন তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে—অধ্যয়ন করেন তাঁদের সাধনার ধারা—পরীক্ষা করেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তির মানদণ্ডে তাঁদের অবদান। নিখুঁত ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁদের নিগূঢ় তত্ত্ব—বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের ভাবধারা আর সেই সঙ্গে বর্ণনা করেছেন নিজের অভিজ্ঞতা তাঁর "A search in secret India" অর্থাৎ "ভারতের

অন্তর্জগতে অনুসন্ধান" নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে। বোম্বাইয়ে মামুদবে, নাসিকে পারসী সাধক মেহের বাবা ও তাঁর গুরু বাবাজান, বারাণসী ধামে প্রখ্যাত জ্যোতিষী সুধেই বাবা, কানপুরে নাথপন্থী সাধক ও গুরু সাহাবজী মহারাজ, মাদ্রাজে হঠযোগী ব্রহ্ম এবং চিঙ্গলিপুটে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের সঙ্গে করেন সাক্ষাৎ—অনুধাবন করেন তাঁদের মত ও পথ—এমন কি অভ্যাসও করেন কাহারও কাহারও নির্দেশিত পথে। শ্রীশঙ্করাচার্যের নিকট জ্ঞান-লোকের সন্ধান চান তিনি। জগদ্‌গুরু নির্দেশ দেন ব্রাণ্টন্‌কে মহর্ষির নিকট যাওয়ার জন্য এবং ব্রাণ্টনের সঙ্গী ও দ্বিভাষিক ভেঙ্কটারমনিকে একান্তে বলেন যে যদিও ব্রাণ্টন্ ঘুরে বেড়াবে অধ্যাত্ম পথের সন্ধানে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরে আসতেই হবে মহর্ষির নিকট—মহর্ষির নিকটই নিতে হবে তার সাধন পথের দীক্ষা—মহর্ষিই তার জন্য ঈশ্বর নির্দিষ্ট গুরু।

তিরুভান্নমালয়ে এলেন পল ব্রান্টন্—পৌঁছিলেন শ্রীরমণ আশ্রমে—ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত মহর্ষিকে দর্শন করে আসন পরিগ্রহণ করলেন তাঁর সম্মুখে—কারো মুখে কোন কথা নেই—মৌন ধ্যানময় অবস্থা সবার—মহর্ষির দৃষ্টি অনুসরণে দেখেন চেয়ে আছেন তিনি দূরে অসীম অনন্তে—সমাহিত তিনি না সমাধি অবস্থা কে জানে?

ধীরে ধীরে ব্রান্টনের চিন্তা সঙ্কুল উদ্বেল চিত্ত শান্ত হয়ে আসে—শান্তির ফল্গু ধারায় ভরে ওঠে হৃদয় মন কিন্তু এই অবস্থা হয় না স্থায়ী—মনে হয় এই কি মহর্ষির সত্যকারের রূপ না ভক্ত শিষ্যদের জন্য এই রূপ পরিগ্রহণ করেছেন তিনি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলেন তিনি মহর্ষিকে—জানতে চান মানুষের মরণের পরে কোন কিছু আছে কিনা আর তা ব্রান্টন্ নিজে উপলব্ধি করতে পারবেন কিনা? উত্তরে মহর্ষি বললেন—

"তুমি বলছ—'আমি' উপলব্ধি করতে পারব কিনা—এই 'আমি' কে? আগে অনুসন্ধান করো 'আমি' কে?—নিজেকে করো বিশ্লেষণ তাহলেই সমাধান হবে তোমার সকল সমস্যার।"

ব্রান্‌টন্ সুখী হতে পাবেন না এই উত্তরে। পরের পর দিন তিনি মহর্ষির আরও নিকট সান্নিধ্য অনুভব করতে চান কিন্তু তার প্রতি মহর্ষির ঔদাসীন্য আরও বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে। হতাশ মন নিয়ে এসে বসেন তিনি ভক্তদের সঙ্গে মহর্ষির সম্মুখে নিয়মিত। হঠাৎ তন্দ্রাভাব আসে তাঁর একদিন—সংগাশূন্যও হ'ন তিনি —সেই অবস্থায় দেখতে থাকেন তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য তার চোখের সামনে। নিজেকে দেখেন তিনি শিশুরূপে—মহর্ষি তাকে সঙ্গে নিয়ে ওঠেন অরুণাচল পর্বতে—সেখানে মহর্ষির দৃষ্টি দৃঢ় নিবদ্ধ হয় তার দিকে—সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর ও মন পরিবর্তিত হতে থাকে— তার জন্মার্জিত প্রবৃত্তি নিচয় পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে তাকে। মহর্ষি বলেন তাকে দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে। সারা পশ্চিম দিগন্ত প্রসারিত হয় তার চোখের সামনে—দেখেন তিনি কোটি কোটি মানব বিচরণ করছে সেখানে—মহর্ষি বলে চলেন—তুমি যখন ফিরে যাবে ওখানে সেই স্থানেও অনুভব করবে তুমি হৃদয়ে শান্তির নির্ঝর ধারা কিন্তু তার মূল্য দিতে হবে তোমাকে। নিজ সত্তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি লাভ করতে হবে তোমাকে—তুমি যে দেহ নও, মন নও, বুদ্ধি নও—তার বোধ আনতে হবে তোমাকে—ভুলতে হবে আমিত্ব—নিবদ্ধ করতে হবে তোমার চৈতন্য একমাত্র তাঁর দিকে যিনি সর্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক পরমেশ্বর।

তন্দ্রা দূর হয়—জেগে ওঠেন ব্রান্‌টন্ কিন্তু স্বপ্নের রেশ তখনও তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এর পরেও তিনি তাঁর মনের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেন না—প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলেন আবার মহর্ষিকে—তিনি ও যথাযথ উত্তর দেন তার সন্দেহ নিরসনেব জন্য—বলেন তাকে তোমার নিজের সত্তাকে চেন তাহলেই প্রকৃত সত্য প্রভাসিত হয়ে উঠবে সূর্য্য কিরণের ন্যায়।

ব্রান্‌টনের ধারণা হয় মহর্ষি তার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিচ্ছেন না, শিষ্য বলে স্বীকারও করছেন না তাকে—হতাশ হয়ে

অবশেষে তিরুভান্নমালয় ত্যাগ করেন তিনি—বেরিয়ে পড়েন আবার পথের সন্ধানে।

পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রে—মঠে, আশ্রমে, মন্দিরে দর্শন করেন সাধু সন্তদের—সেখান হতে আসেন কোলকাতায়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গৃহীশিষ্য শ্রীম (মাষ্টার মহাশয়) এর সঙ্গে করেন সাক্ষাৎ—তাঁর কথাবার্তা ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শ্রবণ করেন তিনি ও বিশেষ আকৃষ্ট হ'ন মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি। কোলকাতা হতে আসেন বারাণসীধামে—অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের পবিত্র ক্ষেত্রে মহান সাধক, ঋষি ও সাধু সন্তদের নিকট যাতায়াত করেন তিনি—অলৌকিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও কার্যাবলী দেখে আশ্চর্য বোধ করেন কিন্তু আকৃষ্ট হ'ন না কোন কিছুতেই। প্রসিদ্ধ সাধক ও গণৎকার সুধেই বাবার গণনায় বিস্মিত হ'ন তিনি। তার অতীত জীবন সম্পর্কে যে সকল কথা বলেন সুধেই বাবা তা অবিকল মিলে যায় ঘটনার সঙ্গে। ভবিষ্যদ্বাণী করেন সুধেইবাবা যে ব্রান্‌টন্ যোগ সাধনা করবেন এবং এক মহান ঋষি তাকে সাহায্য করবেন তার সাধন পথে। পরবর্তী কালে দেখা যায় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

আগ্রায় দয়ালবাগে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা ও গুরু সাহাবজী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্রান্‌টন্—রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের ধর্মমত অনুধাবন করেন তিনি—বর্তমান জাগতিক পরিবেশে কর্মের সহিত সাধনা যুগোপযোগী বলে মনে হয় তার কিন্তু তিনি নিজে আকৃষ্ট হ'ন না।

সেখান হতে নাসিকে আসেন ব্রান্‌টন্—পুনরায় সাক্ষাৎ করেন পারসী সাধক মেহেরবাবার সঙ্গে—কিছু কাল অবস্থানও করেন সেখানে—তাঁর মত ও পথ অনুধাবন করেন কিন্তু উৎসাহ পান না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভ্রমণে বাহির হলেন ব্রান্‌টন্ পশ্চিম ভারতে। এবারে মোটর গাড়ীতেই ভ্রমণ করেন তিনি—গ্রামের পর গ্রাম ও সহর পার হয়ে চলেন। এই ভ্রমণের কালে একদিন সন্ধ্যায় পথি-

পার্শ্বে বৃক্ষতলে আসীন এক সাধু ও তাঁর শিষ্যকে দেখতে পান তিনি। মোটর থেকে নেমে এসে বাঙালী সাধক চণ্ডীদাসকে প্রণতি জানান ব্রান্টন্। চণ্ডীদাস প্রশ্ন করেন তাকে—কোলকাতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীশিষ্য মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি, তাঁকে কেমন লাগে ব্রান্টনের? তিনি আরও জানান যে মাষ্টার মহাশয় আর ইহধামে নাই। আশ্চর্য্য হ'ন ব্রান্টন্ চণ্ডীদাসের কথা শুনে, দুঃখও অনুভব করেন মাষ্টার মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে। চণ্ডীদাস আরও বলেন যে ব্রান্টনের গুরু ঠিক হয়েই আছেন—আর তা এই ভারতেই। বোম্বাইয়ে তাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন চণ্ডীদাস এবং জানান যে সেখানেই পাবেন তিনি পথের সন্ধান। ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি যে ভারতে আসতে হবে ব্রান্টন্‌কে তিনবার—তিনি আরও বলেন যে ভারতের এক মহান ঋষি আছেন তার প্রতীক্ষায়—তাঁর সঙ্গে ব্রান্টন্ এক সুত্রে গ্রথিত।

ভ্রমণরত অবস্থায় অসুস্থ হ'ন ব্রান্টন্। শ্রান্ত এবং ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ফিরে আসেন তিনি বোম্বাইয়ে। অনভ্যস্ত খাদ্য, বাসস্থান, পরিবেশ প্রভৃতির জন্য এবং নিদ্রাহীনতা হেতু তার শরীর ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু আধ্যাত্মিক অবস্থা তার উন্নতির পথেই হয় অগ্রসর।

এ অবস্থায় ইউরোপে ফিরে যাওয়াই স্থির করেন ব্রান্টন্। জাহাজের টিকিটও কাটেন তিনি—সেদিন রাত্রে বিশেষ করে অনুভব করেন তিনি নিজ সত্তার আধ্যাত্মিক পরিবর্তন—অন্তরের বাণীও মূর্ত হয়ে ওঠে তার নিকট—মনে হয় তার নিজের জীবন ছায়া চিত্রের ন্যায়। পর্দার ওপরে ছায়া চিত্রের বিগত দৃশ্য যেমন আর ফিরে আসে না তেমনি জীবনের শেষ হওয়া অধ্যায়গুলিও কেউ ধরে রাখতে পারে না—মানুষ চিরন্তনকে ফেলে অযথা মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ায়।

কয়েকদিন পরেই জাহাজ ছাড়ার দিন কিন্তু অন্তরের স্বর তাকে সতর্ক করে—

"এই ক'বছর কি তুমি বৃথাই নষ্ট করলে? কি সম্বল নিয়ে ফিরবে তুমি? তুমি কি স্থির নিশ্চয় হয়েছ যে যাঁদের তুমি সাক্ষাৎ করেছ এ ক'বছর তাঁদের কেউ কি তোমার গুরু স্থান অধিকার করবেন না?"

মনের দর্পণে প্রতিফলিত হতে থাকে একের পর এক মহান ঋষি ও সাধকদের মুখচ্ছবি—কিন্তু একটীমাত্র মুখ বার বার ভেসে ওঠে তার মানস নেত্রে অন্য সকলকে ছাপিয়ে—যেন ব্রান্টনের দিকেই তিনি স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন—তিনি আর কেউ নন্, তিনি সেই মহান্ জ্যোতির্ময় পুরুষ শ্রীরমণ মহর্ষি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হতাশও হ'ন তিনি এই ভেবে যে মহর্ষি তো তার প্রতি চরম উদাসীন। আবার শোনেন তিনি অন্তরের বাণী—

"তোমার ইউরোপ ফিরে যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করো— ফিরে যাও মহর্ষির নিকট।"

নির্দেশ অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হয় তার। পরদিন প্রাতরাশের পর একটি পত্রও পান তিনি—লিখেছেন মাদ্রাজ বিধান পরিষদের একজন প্রাক্তন সদস্য এবং মহর্ষির ভক্ত—"আপনি আসুন শ্রীরমণ আশ্রমে—প্রকৃত গুরুর দর্শন লাভ করেছেন আপনি এখানে, আশ্রমবাসী সকলেই আপনাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।"

ইউরোপ যাত্রা স্থগিত হয়। মাদ্রাজের পথে যাত্রা করেন ব্রান্টন্—সোজা তিরুভান্নমালয়ে শ্রীরমণাশ্রমে পৌঁছান তিনি। মহর্ষি বসে ছিলেন বেদীর ওপরে—হাস্য মুখে চেয়ে দেখেন তার প্রতি যেন জানতেনই মহর্ষি ব্রান্টন্ ফিরে আসবে কিন্তু মুখে কিছু বলেন না তিনি। আসন গ্রহণ করেন ব্রান্টন্ মহর্ষির সম্মুখে প্রশ্ন করেন সোজা মহর্ষিকে যে তিনি তাকে শিষ্যত্বে বরণ করবেন কিনা? চেয়ে থাকেন ব্রান্টন্ অনিমেষ নয়নে মহর্ষির পানে—ধীরে ধীরে তার অন্তরে প্রবাহিত হয় শান্তির ফল্গুধারা—বিক্ষুব্ধ অশান্ত মন হয় শান্ত। মহর্ষি বলেন উত্তরে—গুরু শিষ্য বলে কিছু নেই—কেবল মাত্র শিষ্যের দিক হতেই এর বাস্তবতা অনুমিত হয়।

যেখানে উপলব্ধি হয়েছে—বোধ এসেছে, সেখানে গুরুও নেই—শিষ্যও নেই—তোমার নিজের অন্তরে অনুসন্ধান করো গুরুর। দেহ প্রকৃত সত্তা নয়। "আমি কে ?"—এই প্রশ্ন নিরন্তর জিজ্ঞাসা করো অন্তরে—বিশ্লেষণ করো সমস্ত সত্তা—'আমি' এই ভাবের উৎস অনুসন্ধান করো।

যদিও এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন না ব্রান্‌টন্—কিন্তু থেকে যান তিনি আশ্রমে—মহর্ষির সান্নিধ্যে বসেই তিনি করেন ধ্যান ধারণা—ধীরে ধীরে দূর হয় তার চিন্তারাশি—অনুভূতি জাগে তার হৃদয়ে।

যতই দিন যায় ততই প্রতিভাত হতে থাকে শ্রীভগবানের মহত্ব ব্রান্‌টনের অন্তরে—আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হয় মহর্ষির উপস্থিতিতে—অবশেষে উপস্থিত হয় সেইদিন যেদিন সত্যই তার মন হয় সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য—মুক্ত, মস্তিস্কের কাজ হয় বন্ধ—যেমন হয় নিদ্রায় অথচ জ্ঞান থাকে পূর্ণমাত্রায়—'আমি কে' এই বোধ আসে সম্পূর্ণরূপে—মনে হয় তার পৃথিবীর চেতনার বাহিরে যেন তিনি করেন অবস্থান—জগৎ বিলুপ্ত হয় তার নিকট—উজ্জল আলোক পরিব্যাপ্ত হয় তার চতুর্দিকে—সেই আলোক সমুদ্রে অবগাহন করে পূর্ণ চৈতন্যে প্রবেশ করেন তিনি।

সমাধি ভঙ্গ হয়—ধীরে ধীরে ফিরে আসেন ব্রান্‌টন্ পৃথিবীর রাজ্যে—মহর্ষির সান্নিধ্যেই আছেন তিনি একথা স্মরণ হয়—মহর্ষির পানে চেয়ে দেখেন যে মহর্ষি তাকে লক্ষ্য করছেন অনিমেষ নয়নে। কারোর মুখে কথা নেই কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে এবারে পরিচিত হ'ন ব্রান্‌টন্ মহর্ষির সাথে। শ্রীভগবানের ভাবঘন করুণা মাধুর্য্য ও তাঁকে ঘিরে যে জ্যোতিঃ প্রবাহ বিকির্ণ হতে থাকে আর তার সাথে মিলিয়ে সমবেত ধ্যান ধারণা হতে উদ্ভূত হয় যে অধ্যাত্ম শক্তি তা সমস্ত সত্তায় অনুভব করেন ব্রান্‌টন্—করেন তাতে পূর্ণ অবগাহন, পৃথক সত্তার লোপ হয় তার, একত্ব অনুভব করেন তিনি মহর্ষির সাথে।

যোগী রামিয়া

যোগী রামিয়া নেলোরের একজন সঙ্গতিপন্ন জমিদার। ছোট বয়সে লেখাপড়া না শিখে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে মিশে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিয়েছেন তিনি। আঠার বছর বয়সের সময় কবীরের জীবনী পড়ে হঠাৎ তাঁর জীবনের গতি অন্যপথে যায়। সঙ্গী সাথীদের পরিত্যাগ করে মনোনিবেশ করেন তিনি ধর্মে। মন্ত্র গ্রহণ করেন গুরুর নিকট—প্রত্যহ জপ করেন ইষ্টমন্ত্র পাঁচ হাজার বার গুরুর নির্দেশে। জপ তপে উৎসাহিত হ'ন রামিয়া—গুরুকে নিবেদন করেন যদি আরও বেশী জপ করেন তাহলে সুফল হবে কিনা? সিদ্ধিলাভ সুগম হবে উত্তর করেন গুরুদেব। আবার প্রশ্ন করেন রামিয়া—যদি সর্ব সময় জপে নিরত থাকেন তিনি? প্রীত হ'ন গুরুদেব শিষ্যের উৎসাহ দর্শনে। সব সময় জপ করতে থাকেন রামিয়া, এমনকি কাজের মধ্যেও বিরামহীন ভাবে জপ করেন তিনি। ক্রমে বৈরাগ্য এত প্রবল হয় যে তিনি উত্তর কাশীতে গিয়ে তপস্যায় নিমগ্ন হতে মনস্থ করেন। যাত্রা পথে সাক্ষাৎ মেলে গুরুদেবের—মাতার সম্মতি ব্যতীত গৃহত্যাগ করতে নিষেধ করেন তিনি। রামিয়া তাঁর গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে মগ্ন হ'ন গভীর সাধনায় এবং শীঘ্রই সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন তিনি। প্রথম প্রথম চন্দ্র সূর্য্য এবং দেব দেবীর মূর্তি দর্শন করেন তিনি সমাধি অবস্থায়। মূর্তি সমূহ একের পর এক প্রকাশ ও অদৃশ্য হতে থাকে তাঁর চোখের সম্মুখে—অনুভব করেন রামিয়া তিনিই ঐ সকলের দর্শিতা ও জ্ঞাতা। ক্রমে মনঃসংযোগ আরও গভীর হতে থাকে—ঐ সকল মূর্তিও হতে থাকে অন্তর্হিত—তাঁর মানস পটে শাশ্বত হয়ে জেগে ওঠে উজ্জ্বল আলোর পর্দা—আর কোথাও কিছু থাকে না কোন দিকে। ঐ চিরন্তনী বিশ্বব্যাপী আলোক বন্যায় পৃথক জ্ঞাতা বা দর্শিতা আর কেউ থাকে না—দর্শক ও দর্শিত বস্তু হয়ে যায় এক—নিখিল বিশ্ব চরাচর একীভূত হয়।

দর্শক ও দর্শিত বস্তু কি এক হয়? সমাধি ভঙ্গে মনে হয় তার; সংশয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করেন তা স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে। সন্তুষ্ট হ'ন না রামিয়া তাঁ'দের উত্তরে—চলে আসেন তিরুভান্নমালয়ে—জিজ্ঞাসা করেন প্রশ্ন মহর্ষির সম্মুখে কাব্যকান্ত শ্রীগণপতি শাস্ত্রীকে। উত্তর করেন কাব্যকান্ত—অবশ্যই দর্শক ও দর্শিত বস্তু এক নয়, তাদের বিভেদ বর্তমান। হতাশ নয়নে রামিয়া চেয়ে থাকেন মহর্ষির পানে, মহর্ষি তৎক্ষণাৎ কাব্যকান্তর উত্তরের পরিপূরক সংযোজন করেন আর সংশোধনও করেন তা নিম্নরূপে—

"দর্শক ও দর্শিত বস্তু পরিদৃশ্যমান জগতে সাধারণ মানুষের নিকট বিভিন্ন কিন্তু সমাধি কালে একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে হয় একীভূত।"

শ্রদ্ধেয় মহান ঋষির সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ উত্তর হৃদয় স্পর্শ করে তাঁর। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায় মহর্ষির উত্তর—অপরিসীম আনন্দ লাভ করেন রামিয়া। সেই দিন হতে রামিয়া বরণ করেন মহর্ষিকে তাঁর অধ্যাত্ম জীবন পথে একমাত্র গুরু এবং পথ প্রদর্শক রূপে। প্রত্যেক বৎসরই নিয়মিত ভাবে কয়েক মাস করে অবস্থান করেন রামিয়া শ্রীরমণাশ্রমে। মহর্ষির পদতলে বসে নিমগ্ন হ'ন সাধনায়—সমাধি অবস্থায় কাটান তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা—হৃদয়ে জাগরূক হয় স্বর্গীয় আনন্দ এবং সুখ সাগরে নিমগ্ন হ'ন তিনি পরিপূর্ণ ভাবে।

যোগী রামিয়া মহর্ষির সান্নিধ্যে বসে সাধনার কথায় নিজেই বলেছেন—"গুরুদেবের পদতলে এসে যখনই বসি সাধনায় তখনই হৃদয়ে অনুভূত হয় শান্তির পরশ—ধীরে ধীরে আসে সমাধি—ডুবে থাকি একসঙ্গে তিন চার ঘণ্টা সমাধিতে—অনুভব করতে থাকি—আমার 'মন' গ্রহণ করে বিশিষ্ট আকার—বেরিয়ে আসে ভিতর হতে—ধ্যান ও সমাধি যতই গভীর হতে থাকে 'মন'ও প্রবেশ লাভ করতে থাকে 'হৃদয়ে' এবং অবশেষে হয় একীভূত তার সঙ্গে—হৃদয়ই যে মনের বিশ্রামস্থল—তার ফলেই তো আসে নিবিড় শান্তি।

রামিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন পল ব্রান্টন্ খুব সুন্দর ভাবে ঃ

"সাধন ভবনে একদিন বিকালে বসে আছেন মহর্ষি—প্রবেশ করলেন এক নূতন আগন্তুক ধীর ও সংযত পদক্ষেপে। প্রথম দর্শনেই মনে হ'ল বৈশিষ্ট আছে আগন্তুকের অন্য সকলের অপেক্ষা, মহর্ষির পাশেই বসলেন তিনি—কথা বলার কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হ'ল না তাঁর দ্বারা—মৌনই রইলেন তিনি। মহর্ষি অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে স্মিত হাস্যে, তিনি যে প্রীত হয়েছেন আগন্তুককে দেখে তা বেশ বোঝা গেল। নূতন আগন্তুকের ব্যক্তিত্ব আমার মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুল্‌ল—অনন্যসাধারণ প্রশান্তি যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে—একটিও কথা বলেন নি তিনি সেদিন।

পরদিন পরিচয় হয় তাঁর সঙ্গে অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হঠাৎ। সাধন ভবন হতে ফিরে আমার নির্দিষ্ট কুটীরের দরজা খুলে প্রবেশ করতে যাচ্ছি—কানে এল সাপের হিস্ হিস্ শব্দ—সভয়ে পিছু হটে আসছি সেই শব্দ শুনে—নজরে পড়ল এক বিষধর সর্প ফণা উঁচু করে চেয়ে রয়েছে আমার পানে। আচম্‌কা এই দৃশ্যে স্নায়বিক উত্তেজনায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম—নড়বার শক্তি রইল না —সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পালাতে যাব পিছু হটে এমন সময় গতকল্যকার সেই সম্ভ্রান্ত আগন্তুক আমার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝে নিলেন তিনি অবস্থা এবং সেই মুহূর্তে ভয়লেশহীন ভাবে প্রবেশ করলেন আমার কুটীরে। আমি চিৎকার করে সাবধান করলাম তাঁকে কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করলেন না —আমি আরও ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। সাপের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি—সাপ ফণা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়ে, তার মুখ গহ্বরে জিব লক্ লক্ করছে—রামিয়া এগিয়ে গেলেন সেদিকে কিন্তু সাপ আক্রমনের কোন চেষ্টাই করল না—তিনি সাপের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন—সাপ ফণা নামিয়ে নিল —ল্যাজে মৃদু আঘাত করলেন তিনি সাপের—ধীরে ধীরে বিষধর সর্প বেরিয়ে গেল ঘর হতে আমাদের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে

জঙ্গলের দিকে। ইতিমধ্যে দু'জন আশ্রমবাসী এসে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে—তাদের মধ্যে একজন বললেন সাপটী কেউটে জাতীয় বিষধর সাপ। আগন্তুকের নির্ভিক কাজে বিস্ময় প্রকাশ করাতে তিনি বললেন—উনি যোগী রামিয়া, মহর্ষির শিষ্যদের মধ্যে অতি উচ্চস্তরের সাধক।

কথা কমই বলেন যোগী রামিয়া। পরিচয়ের পর প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তাঁকে—মৌনই থাকেন তিনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিন্তু আমার নির্বন্ধাতিশয্যে বলেন—

"তোমাদের পশ্চিমের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেদিন ইঞ্জিন আরও বেশী জোরে কি করে চলবে তার চেষ্টা পরিত্যাগ করে আত্ম-সমাহিত হবে—নিজেকে জানবে—সেদিনই প্রকৃত সুখ অনুভব করবে তোমাদের দেশবাসী।"

এলিনর পলিন নোয়ে

কালিফোর্নিয়ার এলিনর পলিন নোয়ে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হ'ন—নিদারুণ মানসিক অশান্তি এবং সেইসঙ্গে দৈহিক অসুস্থতা ও নিদ্রাহীনতার জন্য তার অবস্থা সঙ্গীন হয়েই দাঁড়ায়। মনে হয় তার—বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়ত নিস্তার পাবেন তিনি এ জীবনে। ভগ্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে বেরিয়ে পড়াই স্থির করেন তিনি—জাহেজের টিকিটও কাটেন কিন্তু যাত্রার সময় হঠাৎ নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাত্রা হয় স্থগিত। কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামের পর সুস্থ হ'ন পলিন—আবার যাত্রার উদ্যোগ করেন তিনি—টিকিটও কেনেন জাহাজের —দুর্ভাগ্যের বিষয় এবারেও অনুরূপ অবস্থায় যাত্রা বন্ধ হয়। পরামর্শ দেন জনৈক আত্মীয়—জাহাজ নিউ অরলিনে পৌঁছিবে একমাস পরে, স্থলপথে পৌঁছান যায় সেখানে তিন দিনে, সেজন্য পলিন সুস্থ হয়ে জাহাজ ধরতে পারেন নিউ অরলিনে গিয়ে।

নিউ অরলিনে পৌঁছেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন পলিন—জনৈক ডাক্তারের সেবাসদনে চিকিৎসিত হ'ন তিনি—জাহাজ আসতেও হয় দুই সপ্তাহ বিলম্ব। ডাক্তারের প্রবল আপত্তি সত্বেও জাহাজে ওঠেন পলিন। জাহাজ চলে সোজা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন অভিমুখে। পথে মরণাপন্ন হ'ন পলিন পুনরায় কিন্তু কেপটাউনের পুর্বে কোন স্থানে জাহাজ না ভিড়ায় আশ্রয় নিতে পারেন না কোন বন্দরে। ডারবানে অবতরণ করেন তিনি এবং একমাস বিশ্রাম গ্রহণ করেন সেখানে।

পলিনের মানস পটে ভেসে ওঠে ভারতের নাম—মনে হয় সেখানেই যেন তিনি লাভ করবেন অভিষ্ট। কোলকাতাগামী জাহাজে যাত্রা করেন পলিন—ভারত মহাসাগরের সমীপবর্তী হয়ে কোলকাতার পরিবর্তে মাদ্রাজে অবতরণের সঙ্কল্প করেন তিনি। জাহাজের সঙ্গী সাথীরা কোলকাতায় যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান তাকে কিন্তু তিনি মাদ্রাজেই নামেন এবং সেখানকার সেরা হোটেল কনিমারায় ওঠেন। মাদ্রাজের গরম তার অসহ্য বোধ হওয়ায় চলে আসেন শৈলাবাস কোদাইকানালে।

কোদাইকানালের সুন্দর শীতল পরিবেশে তার শরীর মন জুড়িয়ে যায়। স্থানীয় এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন পলিন—কোন সাধু মহাত্মাকে তিনি জানেন কিনা? তিনি তাকে রমণ মহর্ষির কথা জানান—তাঁর সাধন ইতিহাসও বলেন তাকে।

পরদিনই তিরুভান্নমালয় যাওয়ার সঙ্কল্প করেন পলিন—হোটেলে পরিচিত এক ইংরাজ রাজকর্মচারী ও তাঁর স্ত্রী নিষেধ করেন তাকে একাকী ঐরূপ আশ্রমে যেতে—সাবধান করেন সেস্থানের খাদ্য, পরিবেশ প্রভৃতি তার উপযোগী হবে না বলে কিন্তু পলিন গ্রাহ্য করেন না তাদের নিষেধ—বেরিয়ে পড়েন অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে।

রেলে তিরুভান্নমালয় ষ্টেশন এবং সেখান হতে দীর্ঘ পাঁচ মাইল রাস্তা গরুর গাড়ীতে অতিক্রম করে শ্রীরমণ আশ্রমে এসে

উপস্থিত হ'ন পলিন। নিরঞ্জনানন্দ স্বামী স্বাগত জানান তাকে। আশ্রম ভোজনালয়ে প্রাতরাশ শেষ করে বিপুল ঔৎসুক্য ও আগ্রহ নিয়ে আসেন তিনি সাধন ভবনে—সেখানে দিবারাত্র সব সময় মহর্ষি নিবিষ্ট থাকেন ধ্যান ধারণায়—উপদেশ দেন শিষ্য ও ভক্ত জনকে। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে তার বক্ষ, সেই মুহূর্তে স্পষ্ট অনুভূত হয় শ্রীভগবানের করুণা কৃপা বর্ষণ হয় সমাগত সকলের পরে, মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে—শ্রীভগবানের সান্নিধ্য আনে ভগবৎ অনুভূতি।

মহর্ষি বসেছিলেন ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে—পলিনের দিকে চেয়ে মৃদু হাস্য করেন শ্রীভগবান—মনে হ'ল পলিনের যেন সেই মুহূর্তে তার জন্য স্বর্গের দুয়ার উন্মুক্ত হ'ল—মহর্ষির প্রেম ও অনুকম্পাভরা দৃষ্টি আশীর্বাদ স্বরূপ হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করল তার। পলিন স্পষ্টই অনুভব করলেন—কথার প্রয়োজন নেই মহর্ষির নিকট—কথা অপেক্ষা তাঁর নীরব ভাষাই অধিক শক্তিশালী। শ্রীভগবানকে দেখামাত্রই পলিনের মনে হ'ল এমনটী আর কাউকে দেখিনি—এমন অপূর্ব অনুভূতি আর কোথাও পাইনি--মনে হয় তার এই পৃথিবীতে শ্রীভগবানের মত আর একজনও নেই। তাঁকে দেখা মানেই তাঁকে ভালবাসা—কেবলমাত্র তাঁর মহান পবিত্র উপস্থিতি ভুলিয়ে দেয় দুঃখ বেদনা--সুষমায় মণ্ডিত করে সমগ্র সত্তা—চিন্ময়ের পরশ আনে মনে। পলিন দৃঢ়নিশ্চয় হয়—যখনই শ্রীভগবান চেয়ে দেখেছেন তার দিকে তখনই তিনি দেখে নিয়েছেন তার অন্তর বাহির—বুঝে নিয়েছেন কি তার প্রয়োজন।

শ্রীরমণাশ্রমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন পলিন সুন্দর ভাবে —"এর পরে ফিরে গেলাম আমার জন্য নির্দিষ্ট কুটীরে। আমার শরীরের ভগ্ন ও মরণাপন্ন দশায় আমার নিকট হতে ঘুম বিদায় নিয়েছিল গত কয়েক বছর, এমন কি ঘুমের জন্য নিয়মিত ঔষধ প্রয়োগেও হয়নি কোন সুফল--কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় বিনা ঔষধেই

সে রাত্রে গভীর নিদ্রায় কাটাই আমি—যদিও মহর্ষির নিকট নিদ্রাহীনতার বিষয় কিছুই জানাইনি আমি।

পরদিন প্রাতে সুস্থ মন ও সবল দেহ নিয়ে উঠলাম ঘুম থেকে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে—মনে হ'ল বহুবছর দেহ মনের যে বিপর্যয় গিয়াছে আমার ওপর দিয়ে তার শেষ হয়েছে এবার—নিদ্রাহীনতারও শেষ হয়েছে সেই সঙ্গে চিরতরে। কয়েকদিন পরের কথা—দাঁড়িয়ে ছিলাম কুটীরের দ্বার দেশে—মনটা খুসিতে ভরা ছিল, মহর্ষি চলেছেন তখন পর্বত পরিক্রমায়, আমাকে দেখে সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—হৃদয়ে অধিক শান্তি অনুভব করছি কিনা এখন? তাঁর কথায় আনন্দের পরিসীমা থাকল না আমার—ঘাড় নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। গভীর ভক্তিতে ও অপরিসীম শান্তিতে হৃদয় মন ভরে গেল। পূর্বে যে সমুদয় বিষয় অতিশয় প্রয়োজনীয় বলে বোধ হত সেই সকলের ওপর থেকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ কমতে থাকে—প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে আমার সম্মুখে।

শ্রীভগবানের প্রথম ও শেষ কথা—সমাহিত হও, নিজেকে জান। ধ্যানে তন্ময় হয়েছি শ্রীভগবানের নির্দেশিত পথে—ধীরে ধীরে জ্ঞানের উন্মেষ হয় হৃদয়ে—নূতন দৃষ্টিতে দেখি জীব ও জগৎ—ঈশ্বরের নাম রূপ রসে হৃদয় মন হয় পরিপূর্ণ। আশ্রমে ছ'মাস অবস্থানের পর দেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করি কিন্তু তার পূর্বে সমগ্র ভারত দর্শনের অভিলাষও হয় মনে। শেষের কদিন কষ্টই হয় আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে হয়ে। সান্ত্বনা দেন শ্রীভগবান—"যেখানেই তুমি থাক—ডাকলেই পাবে আমাকে।"

যাত্রার দিন ক্রন্দন রোধ করতে পারি না—ইচ্ছা করেই সেদিন সকালে সাধন ভবনে গেলাম না—অপরাহ্নে এসে বসলাম শ্রীভগবানের সম্মুখে—নতজানু হয়ে অবনত মস্তকে গভীর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে প্রেমময় গুরুর আশীর্বাদ যাচিঞা করলাম—বললাম—তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার ইষ্ট

ভগবান—আমি যেন যুগ-যুগান্ত ধরে তোমারই করুণা কণায় বর্ধিত হই আর যে কাজই আমি করি তা যেন তোমারই কাজ হয়।

আশ্রমের সবার নিকট হতে বিদায় নিলাম শোকার্ত চিত্তে। গভীর বেদনাহত মন নিয়ে উঠ্‌লাম গরুর গাড়ীতে—এগিয়ে চললাম মন্থর গতিতে রেল ষ্টেশনের দিকে—ছেড়ে যাচ্ছি আমার অন্তর-দেবতাকে—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হল দীর্ঘ দুইমাস কাল তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি—তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি—সেইত আমার পরম পাওয়া।

মাদ্রাজে পৌঁছে ভারত ভ্রমণের স্পৃহা আর থাকে না—মন ফিরে যেতে চায় মহর্ষির সান্নিধ্যে। জোর করেই বেরিয়ে পড়ি শ্রীনগরের পথে—সেখান হতে পথে বহু দ্রষ্টব্যস্থান পরিদর্শন করে চলে আসি কোলকাতায়। নিদারুণ গ্রীষ্ম—কিন্তু অসুস্থ হইনি কোথাও—যে সকল খাদ্য গ্রহণ করেছি ভ্রমণ কালে তা অতীতে কোন দিন কল্পনাই করতে পারতাম না—কিন্তু তার জন্য অসুখ হয়নি একদিনও। অতীতে আমার স্বামীর সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকায় ভ্রমণকালে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পরিবেশ রেহাই দেয়নি পেটের পীড়ার আক্রমন হতে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ কি পার্থক্যই না সৃষ্টি করে। শ্রীভগবানের কৃপা করুণা এবং তাঁর প্রতি আমার অসীম নির্ভরতা রক্ষা করেছে আমাকে পথে প্রবাসে সকল প্রকার বিপদ আপদ হতে।

শ্রীভগবানের নিকট হতে চলে আসার পর হতেই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বেড়ে চলে শতগুণে দিনের পর দিন—অন্তরে তাঁর ডাক শুনি—ফিরে আয় আমার কাছে। ফিরে যাওয়ারই সঙ্কল্প করি আমি আশ্রমে। কোলকাতা হতে পরের জাহাজে আমেরিকা যাত্রার পরিবর্তে রেল ধরি তিরুভান্নমালয় যাওয়ার জন্য —আনন্দে অধীর হই পিতৃগৃহে ফিরে যাচ্ছি মনে করে। শ্রীভগবান যে ভাবে সস্নেহ অভ্যর্থনা করেন আমাকে তা চিরজাগরূক হয়ে থাকবে আমার অন্তরে। আনন্দে আত্মহারা

হই এই ভেবে যে সত্যই আমার অশেষ ভাগ্য যে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আবার ফিরে আসতে পেরেছি। মৌনই ছিলেন মহর্ষি কিন্তু স্পষ্টই মনে হয় তাঁর বাণী এবং করুণারশ্মি অনুপ্রবেশ লাভ করছে আমার অন্তরে—শান্তি! নিবিড় শান্তি পরিব্যাপ্ত হয় আমার সর্ব চৈতন্যে।

জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আমেরিকা ত্যাগ করে যখন বেরিয়ে পড়ি অজানার পথে তখন চেয়েছিলাম জীবনে একটী মাত্র জিনিষ —তা হচ্ছে—শান্তি। যার জন্য আমার সারা অন্তরের আকুল আগ্রহ এই রোগগ্রস্থ দুর্বল দেহটাকে টেনে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপা করুণা টেনে এনেছে আমাকে শ্রীভগবানের পদতলে—দিয়েছে নিবিড় শান্তি, সমৃদ্ধ করেছে আমার অন্তরলোক—অনুভব করিয়েছে স্বর্গরাজ্যের বিশ্রাম।

পাঁচ মাস ধরেই পরিকল্পনা করি প্রত্যাবর্তনের। যখনই মনে ভাবি যাব—প্রত্যেকবারই ঘটে কোন না কোন ঘটনা যার জন্য যাওয়া হয় স্থগিত। অন্তরলোকে দেখি একদিন আমেরিকায় ভগ্নি অসুস্থা, আমার যাওয়া অত্যাবশ্যক। সেই দিনই ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করি সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় বারে আশ্রমে আসার পর অতিবাহিত হয়েছে আটমাস কাল—তা সত্বেও যতই নিকট হয় যাত্রার সময়—অনুভব করি অন্তরে অপরিসীম বেদনা। যাত্রার পূর্বে এসে বসি মহর্ষির পদতলে—চোখের জলে ধুইয়ে দিই তাঁর রাতুল চরণ যুগল—তিনি যে আমার দেবাদিদেব—আমার ইষ্টদেবতা—আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয়।

বছর ঘুরে আসে—আবার পার হয় বছর—দূর হতে আরও নিবিড় ভাবে অনুভব করি তাঁকে আমার অন্তরে—আমার পরম গুরুর উপস্থিতি বোধ করি আমার অন্তরলোকে—ঠিক যেমনটি তিনি বলেছিলেন—'যেখনেই থাক তুমি—আমাকে পাবে তোমার

কাছে'। তাঁর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে চলে সহস্র লক্ষগুণে—আবার যেন তাঁর ডাক শুনতে পাই হৃদয়ে। ফিরে যাব আমার পরম পিতার নিকট যত শীঘ্র সম্ভব।

এই কথাই শুধু মনে হয় আজ—জীবনে যে চায় আশীষ পরমেশ্বরের, তাকে জানতে হবে গুরু ও ভগবান এক এবং অভিন্ন—আর তার নিজেরই অন্তরাত্মা সত্য এবং শাশ্বত। নির্ভর করতে হবে তাকে একান্তভাবে তাঁর ওপর—তবেই ঝরে পড়বে গুরুর আশীর্বাদ অঝোর ধারায়—লাভ করবে সে অনাবিল শান্তি।

শুদ্ধানন্দ ভারতী

শুদ্ধানন্দ ভারতী—নেতা, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী এবং তামিল সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রতিভার মধ্যেও ধর্মকে ভোলেননি তিনি। নানা ধর্মমত ও পথের সঙ্গে তিনি হ'ন পরিচিত এবং সাধনাও করেন কোন কোন পথে। তাঁর অনিসন্ধিৎসু মন ও দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খৃষ্টান, পারসী এবং মুসলমান ধর্মগ্রন্থ সমূহ। যখন তিনি মহিশূরের শ্রাবন-বেলা-গোলায় জৈন ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়নে রত ছিলেন সেই সময় অন্তরে ডাক শোনেন শ্রীভগবানের। বহুদিন পূর্বেই তিনি শুনেছিলেন মহর্ষির কথা—আকৃষ্টও হয়েছিলেন তাঁর পূত চরিত্র ও সাধন ইতিহাস জেনে দূর হতে। তখন হতেই অন্তরে ক্ষীণ দীপশিখারূপে জ্বল্‌ছিল মহর্ষির সান্নিধ্য লাভ ইচ্ছা, এখন তা প্রবল আকারে অগ্নিশিখারূপে প্রকাশ পায় হৃদয়ে—আর দেরী করেন না, চলে আসেন তিনি তিরুভান্নমালয়ে শ্রীরমণ আশ্রমে। দর্শন করেন মহর্ষিকে—প্রথম দর্শনেই মনে হয় তাঁর মহর্ষিকে পবিত্র ভস্মস্তূপ রূপে—পরক্ষণেই মনে হয় তাঁকে অগ্নিস্তম্ভরূপে এবং তার পরেই মনে হয় তাঁকে শিবলিঙ্গরূপে।

ভারতী কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন না মহর্ষিকে—কোন পরামর্শও চান না তাঁর নিকট হতে—কেবল মাত্র অপলক নেত্রে

চেয়ে থাকেন তিনি মহর্ষির দিকে এবং সেই প্রথম সাক্ষাতের এক ঘণ্টার মধ্যে রচনা করেন কাব্য মহর্ষিকে প্রশস্তি করে তামিল ভাষায়—যে কাব্য অমর হয়েছে তামিল সাহিত্যে ও ধর্মে।

ভারতীর মহর্ষিকে দর্শনের পালা সাঙ্গ হলে ধীরে প্রশান্ত বদনে জিজ্ঞাসা করেন মহর্ষি—কোন্ ভারতীকে দেখছি আমার সম্মুখে, একি সেই ভারতী যে করেছে রচনা 'ভারত শক্তি'? মহর্ষির নিকট হতে পরিচিতি লাভে সুখানুভব করেন ভারতী অন্তরে—জানান নত মস্তকে যে তিনিই সেই ভারতী। নিবেদন করেন—শ্রীভগবানের কৃপা করুণা লাভ করলে হতে পারেন তিনি সাধন পথে অগ্রসর।

শ্রীভগবানের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদে ভারতীর মন হয় চিন্তাশূন্য ও অন্তর্মুখীন—ক্রমে ক্রমে দূর হয় তার আমিত্বভাব, নিমগ্ন হ'ন তিনি ধ্যান ও ধারণায়। ছয় মাস নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মহর্ষির সান্নিধ্যে বসে নিবিষ্টমনে করেন তিনি জপ তপ ও সাধনা। এর পরে চলে আসেন তিনি পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে—নিয়োজিত করেন নিজেকে শক্তি আরাধনায় এবং রচনা করেন সেখানে বসে প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য 'রমণ বিজয়ম'—শ্রীরমণ মহর্ষির জীবন কথা—যার প্রতি ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শ্রীভগবানের প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা—আর যা সৃষ্টি করেছে গদ্য কাব্যে এক নূতন ধর্ম সাহিত্য।

মৌনী সাধু

বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মিত্র পক্ষীয় সৈন্য বাহিনীর এক যুবক কর্মচারী রণক্লান্তির অবসরে অমাবস্যার নিবিড় আঁধারে একান্তে চেয়ে ছিলেন শূন্যে অসীম আকাশের দিকে। মেঘমুক্ত আকাশে নিকটে দূরে বহুদূরে উজ্জ্বল ক্ষীণ ও ক্ষীণতর প্রভায় জ্বলছিল তারকারাজি—হঠাৎ তার সামনে নভোমণ্ডলের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ছুটে যায় এক জ্বলন্ত তারকা—খসে

পড়ে তা আকাশ হতে পৃথিবীর বুকে। যুবকের মনে হয় জীবনও তো এই—বৃন্তচ্যুত হয়ে কোথায় কোন্‌দিন তলিয়ে যাবে সে, তার চিহ্নও থাকবে না কোথাও।

মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে—রণক্লান্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ রুধিরের ধারায় কর্দমাক্ত—মানুষের জিঘাংসার শেষ হয়নি আজও কিন্তু সেদিনের সেই যুবকের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল—তার মীমাংসার জন্য ভ্রমণ করেছে সে দেশে বিদেশে—সন্ধান করেছে আলোকের; পশ্চিমের বস্তু তান্ত্রিকতার মধ্যে তার হদিস মেলেনি কোথাও—আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়েছে সে পূর্ব দিগন্তে—ফুটে উঠেছে সেখানে জ্যোতিঃতরঙ্গ তাই সে ছুটে এসেছে অধ্যাত্ম জগতের লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষে।

ইউরোপে থাকতেই আকৃষ্ট হয়েছে সে মহর্ষির প্রতি—তাঁর প্রদর্শিত পথে সুরু করেছে সে ধ্যান ও ধারণা—এর পূর্বে নানা মত ও পথ এনেছে বিভ্রান্তি—ক্লান্ত হয়েছে সে কৃচ্ছ সাধনায়—কিন্তু অভিষ্ট মেলেনি। বিগত কয়েক বছর করেছে সে যোগ সাধনা, হয়েছে তার দৈহিক উন্নতি—স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজনা হয়েছে হ্রাস কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়নি উল্লেখযোগ্য, আর যাওবা অগ্রসর হয়েছে সে ও পথে অল্প কিছু দূর—সামান্য দিনের বিরতিতে বহু দিনের কষ্টার্জিত ফল হয়েছে নস্যাৎ। অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হতে যোগ সাধনাই যে একমাত্র পথ একথা বলেন না মহর্ষি—তাঁর পথ সোজা ও সরল—তাঁর নির্দেশ, নিজেকে জান তাহলেই হবে তোমার সব জানা। অন্য পক্ষে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে সংসার হতে কার্যতঃ বিদায় না নিলে অধ্যাত্ম জীবনে যায় না অগ্রসর হওয়া—কিন্তু মহর্ষি প্রদর্শিত সোজা পথে সংসারে কর্মের মধ্যেও সকলের পক্ষেই অধ্যাত্ম জীবনে সফলতা লাভ করা যায়—অবশ্য উপযুক্ত হতে হবে তার জন্য।

মৌনীসাধু গ্রহণ করেন কায়মনোবাক্যে মহর্ষি প্রদর্শিত সোজা পথ—রত হ'ন সর্বসময়, কাজের মধ্যে এবং অবসরে—

বাড়ীতে, রাস্তায়, কর্মস্থলে, ট্রামে, বাসে, রেলগাড়ীতে—'আমি কে'—এই প্রশ্নে বা বিচারে। অভ্যস্ত হ'ন তিনি সর্বদাই 'আমি কে'—এই প্রশ্নে তার অন্তরকে ব্যাপৃত রাখতে। সময় আসে যখন মনের গভীরে বিনা আয়াসে স্বতই উত্থিত হয় বিচার বা 'আমি কে' এই জিজ্ঞাসা এবং তা অনুষিক্ত করে তার দেহের প্রতি অণু পরমাণু—হৃদয় মন শান্তিতে প্লাবিত হয়—এবং তা শক্তিরূপে ব্যবহারের ক্ষমতা জন্মে তার।

মহর্ষির প্রত্যাদেশে অনুভব করেন মৌনী সাধু শাশ্বত জীবন ধারা—অবিচ্ছেদ চৈতন্যে করেন তিনি অবস্থান—উপলব্ধি করেন আত্মা অবিনশ্বর। আর চিন্তারাশি উদ্ভূত হয়না—খণ্ড খণ্ড মেঘের ন্যায় উদয় মাত্র তা হয় লয়। চেয়ে থাকেন তিনি মহর্ষির নয়নের দিকে স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে—হঠাৎ অনুভব করতে থাকেন মহর্ষির জীবন এ জগতের নয়—সেখানে ঝড় নেই, ঝঞ্ঝা নেই, পরিবর্তন নেই—দুকূল ছাপিয়ে নামে তার চোখে অশ্রুর বন্যা—কি কারণ তিনি জানেন না—বোধ হয় জীবনের মলিনতা ও কালিমা সেই অশ্রু বন্যায় ধুয়ে মুছে হয় নির্মল। ধ্যান ধারণা চলতে থাকে মহর্ষির সান্নিধ্যে বসে—এর পরে নেমে আসে চোখের জলের পরিবর্তে ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে 'শান্তি' —তাঁর হৃদয়ে এনে দেয় অবর্ণনীয় সুখরাজি—যা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পান না মৌনী সাধু।

অন্তরের অন্তস্থল হতে অনুভব করেন মৌনী সাধু গুরুকৃপা কত প্রয়োজন আত্মস্বরূপ বা চিন্ময়ের উপলব্ধিতে—তিনি জানেন মহর্ষি হতে বিকিরণ হয় যে অধ্যাত্ম রশ্মি তা স্বয়ংক্রিয়রূপে আনে এই ফল। বলেন মৌনী সাধু—"চেয়ে দেখি সাধন ভবনে সমবেত ভক্ত সাধু ও অনুরক্ত জনের দিকে—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইউরোপীয়, আমেরিকান—পুরুষ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, যুবা—সকলেই এখানে মহর্ষির পদতলে বসে সুখী। প্রত্যেকেই তার গ্রহণক্ষমতা অনুসারে সুখানুভব করেন। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মনে করেন তাঁর মুক্তি সন্নিকট,

চাষী কৃষক মহর্ষির সান্নিধ্যে বসে মনে করেন—এবারে তার ক্ষেতে ফলবে সোনার ফসল, আমেরিকান মনে করেন সে পাবে সাধনায় শান্তি এবং মুক্তি, আমার মনে হয় ঘন কুয়াশা যা দিগ্‌বলয়কে রেখেছে ঢেকে তা ধীরে ধীরে সরে যায়—দিন আমার আগত যেদিন আমার ও সত্যের মাঝে আর কিছু থাকবে না—অপ্রত্যাশিত ভাবে লক্ষ্য করতে থাকি, যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যা কিছুকাল পূর্বেও অবোধ্য ছিল আপনা হতেই তার সমাধান হয়ে যায়। মানুষ যাদের এখানে দেখি তাদের আর পৃথক বলে মনে হয় না—উপলব্ধি হয় সকলের ভিতর বর্তমান সেই একই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয় আমার অন্তরে—আমি দেখতে আরম্ভ করি মৌনী সাধুকে পৃথক ভাবে—যেমন দেখি অন্য বিষয় বস্তু সমূহকে—মনে হয় এই বাহিরের খোলসের কোনই গুরুত্ব নেই—এ গ্রহণ করে শ্বাস প্রশ্বাস—এর ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত হয়—এর মনের চতুষ্পার্শে চিন্তারাশি করে আকুলি বিকুলি। আমি জানি এর পরের স্তরে দেখব এই দৃশ্যমান জগতের বিলুপ্তি—আমি থাকব চিরন্তন হয়ে—নামহীন আকারহীন ভাবে।

দূরে অবস্থান করেও এবং গুরুদেবকে না দেখেও আমি অনুভব করি তাঁর উপস্থিতি। গুরুদেব বলে যে দেহকে দেখি তিনি গুরুদেব নন্—গুরুদেব চিরন্তন সত্য ও মৌন—তাঁর মধ্যে উপলব্ধি করি নিজেকে—এইই চিরন্তন সত্য এবং ধ্রুব। অনুভব করি সত্যকে সমগ্র সত্তায়—বাস করি সত্যে—অনুরণিত হয় হৃদয়ে—সত্যই জীবন—যেখানে সত্য নাই সেখানে জীবনও নাই।”

অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তজন

মহর্ষির শত সহস্র শিষ্য ও ভক্তের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের সাধন ইতিহাস ও অনুভূতির কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ সকল চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় কিরূপে বিভিন্ন পথের সাধক ও ভক্তকে এবং বিভিন্ন অধ্যাত্ম শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রসর

করিয়েছেন মহর্ষি সাধনার উচ্চস্তরে। অন্যান্য ভক্ত ও শিষ্যগণেরও আছে নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাবধারা ও সাধন ইতিহাস। শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে এসে যারা শ্রীরমণাশ্রমকে করেছেন নিজ আলয় বা আশ্রমের চতুষ্পার্শে রচনা করেছেন নিজ বাসস্থান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রাক্তন জঙ্গী মেজর স্যাডউইক, সম্ভ্রান্ত পার্শী মহিলা মিসেস্ তালেয়ার খাঁন, ইরাকের শান্ত সমাহিত সাধক এস্ এস্ কোহেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর হাফিজ সৈয়দ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার আর্থার অসবরন্, শ্রীবিশ্বনাথন্, বিখ্যাত তামিল কবি মুরুগানর, রামস্বামী পিলাই, প্রসিদ্ধ গায়ক রামস্বামী আয়ার, অনন্ত নারায়ন রাও প্রভৃতি।

যে সকল ভক্ত ও অনুরক্তদের স্থায়ীভাবে আশ্রমবাস সম্ভব হয়নি—এসেছেন তাঁরা মাঝে মাঝে শ্রীরমণাশ্রমে—অনুপ্রেরণা বা অনুভূতি লাভ করে মহর্ষির নিকট হতে ফিরে গেছেন নিজ নিজ স্থানে—উপলব্ধি করেছেন চরম সত্য—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ভেঙ্কটারামিয়া, গ্রাণ্ট ডাফ, ডক্টর জি, এইচ্ মিইস্, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অধ্যাপক ডাঃ বি, এল, অত্রেয়, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর কে সুন্দরম চেটিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার কে, কে, নামবেয়ার, ডান্‌কান্ গ্রীনলিস্ প্রভৃতি আরও শত সহস্র ভক্তজন।

মহর্ষির ভক্ত ও অনুরক্তদের মধ্যে তাদের সংখ্যাও কম নয় যারা আসেন নি বা যাদের পক্ষে আসা সম্ভব হয় নি কোন দিনই তিরুভান্নমালয়ে শ্রীরমণাশ্রমে—দূর হতেই আকৃষ্ট হয়েছেন তারা শ্রীভগবানের প্রতি—বরণ করেছেন শ্রীভগবানকেই তাদের গুরু বা জীবন দেবতারূপে—সাধনা করেছেন তারা তাঁরই নির্দেশিত পথে—অনুভব করেছেন মহর্ষির আত্মিক উপস্থিতি নিজেদের অন্তরে—অনুভূতি লাভ করেছেন নিরন্তর 'আমি কে' এই জিজ্ঞাসা বা বিচারের দ্বারা।

মহর্ষির উপদেশ

শিষ্য, ভক্ত, মুমুক্ষু, অনুরক্ত ও আগতজনের প্রশ্নোত্তরে এবং তাদের প্রতি মহর্ষির উপদেশাবলীর মধ্য দিয়েই মহর্ষির ভাবধারা এবং জীবনবেদ হয়েছে পরিস্ফুট। তাঁর উপদেশাবলীর মধ্যে এবং তাঁরই নির্দিষ্ট আত্মজ্ঞানের সোজা পথে পৃথিবীর সকল দেশের মানব ধর্মমত নির্বিশেষে সন্ধান পেয়েছেন চরম সত্যের, উপলব্ধি করেছেন চিন্ময়ের—তাইতো দক্ষিণ ভারতের ক্ষুদ্র সহর তিরুভান্নমালয় হতে পাঁচ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ অরুণাচল পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত শ্রীরমণাশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন পৃথিবীর সর্বদেশের জ্ঞানী গুনী ভক্ত অনুরক্তের দল—বসেছেন তারা মহর্ষির পদতলে ভূমি-আসনে। ভগবানে যিনি বিশ্বাসী তিনি দ্বিগুন বিশ্বাস নিয়ে, অনুভূতি নিয়ে ফিরে গেছেন—যিনি সংশয়াকুল তিনি হয়েছেন সংশয় মুক্ত, যিনি নাস্তিক তিনি হয়েছেন আস্তিক—মহর্ষির উপদেশে তৃপ্ত হয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা—পথের সন্ধান ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তারা।

শ্রীভগবানের ভক্তজনের সহিত কথোপকথন ও উপদেশাবলী স্বষ্টি করেছে ধর্ম সাহিত্যে নূতন অবদান—উৎস হয়েছে তা মুমুক্ষু ও মুক্তিকামী মানবের অনুপ্রেরণার।

মহর্ষির উপদেশের সার হচ্ছে—নিজেকে জান—বিচারের দ্বারা বিশ্লেষণ করো নিজেকে—অর্থাৎ 'আমি কে' নিরন্তর এই জিজ্ঞাসা দ্বারা নিজ সত্তাকে করো আবিস্কার। মহর্ষি বলেন যে বিচারের দ্বারা যখন বিশ্লেষণ করবে নিজেকে তখন সংশয়হীন ভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে দেহ ও মন অস্থায়ী এবং সীমাবদ্ধ—তা' সত্যের রাজত্বের বাহিরে। বিচারের দ্বারা যা নয় স্থায়ী, যা অসত্য—তাকে পরিত্যাগ করতে হবে—এইরূপে বাদ হতে হতে শেষে যা অবশিষ্ট থাকবে তাহাই আত্মসত্তা বা স্বরূপ বা ব্রহ্মণ। অবিরাম এবং দৃঢ় বিচারের দ্বারা পৌঁছান যায় এই অবস্থায়। মহর্ষির মতে

প্রকৃত সত্তা সকলের ভিতরে সর্বদাই বর্তমান কেবল জড়ের আস্তরণে বা মায়ায় তা থাকে ঢাকা ; যা আমাদের করণীয় তা হচ্ছে ঐ আবরণ বা মায়া দূর করা—তাহলেই প্রকাশিত হবে আত্মসত্তা—এর জন্য বাইরে খোঁজার কোন আবশ্যকতা নেই।

মহর্ষির কথা—ঈশ্বর এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—কাজ করবে অহং ভাব শূন্য হয়ে—তুমি যে কাজ করছ একথা মনে করবে না—এই অবস্থাকে অহং ভাব শূন্য হয়ে চৈতন্যে অবস্থানও বলা যায় ; অবিচ্ছেদ চৈতন্যে অবস্থান বা শাশ্বত জীবনের অর্থ ই আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস।

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হতে এলেন শ্রীদিলীপকুমার রায় ; মহর্ষির অনাড়ম্বর সরল ও মহৎ জীবনযাত্রা প্রণালী দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে—"সাধন ভবনে প্রবেশ করলাম সন্দেহযুক্ত মন নিয়ে—আসবার পুর্বে মহর্ষিকে যাঁরা দেখেছেন এবং যাঁরা দেখেননি এইরূপ বহু ব্যক্তির নিকট শুনেছিলাম তিনি জ্ঞানমার্গের সাধক—তিনি জ্ঞানী, ভক্ত নন্। কিন্তু সেই স্মরণীয় দিনে যখনই তাঁকে দর্শন করি তখনই তাঁর আকৃতি দেখে মনে হয় আমার—এ কথা সত্য নয়। তাঁর মুখ এতই কোমল এতই সমবেদনাপূর্ণ···আমার ভ্রমনরত বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় জীবনে এরূপ একজন মানবের সহিত সাক্ষাৎ করিনি যিনি বর্ণনার অতীত অথচ যিনি এরূপ অন্তঃস্পর্শী। প্রকাশ করে বলবার ভাষা আমার নেই—তাঁর অচঞ্চল চক্ষু নিবদ্ধ করে আমার প্রতি কি প্রবলভাবে আমার গভীরতম অন্তরে নাড়া দিয়েছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে যখন দৃষ্টি মেলাই স্নাত হই তখনই শান্তির বন্যা ধারায়—তা যেমন কারণাতীত তেমনই আনন্দময়।······পরে গুরুবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তিনি মহর্ষিকে—

প্রঃ—কেউ কেউ বলেন মহর্ষির মতে গুরুর প্রয়োজন নেই—কেউ বা বিপরীত কথা বলেন—এ বিষয়ে মহর্ষির অভিমত কি ?

উঃ—গুরুর প্রয়োজন নেই একথা আমি বলি না ;

প্রঃ—শ্রীঅরবিন্দ অনেক সময় বলেন আপনার কোন গুরু ছিলেন না ;

উঃ—এ নির্ভর করে কাকে গুরু বলা হয় তার ওপর—গুরু যে মানুষ বা মনুষ্য দেহধারী কেউ হবেন তার কোন অর্থ নেই। দত্তাত্রেয়ের ২৪ জন গুরু ছিলেন—যাঁদের মনুষ্যাকৃতি ছিল না। গুরুর নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে—উপনিষদ বলেন গুরু ব্যতীত অপর কেহ মানবকে মন ও বুদ্ধির বাহিরে নিয়ে যেতে পারেন না।

প্রঃ—আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে মনুষ্য দেহধারী গুরুর কথা—মহর্ষির সেরূপ কেউ ছিলেন না ?

উঃ—আমারও কোন সময় না কোন সময় গুরু থাকতে পারেন, আমি কি অরুণাচলের স্তুতি করি নাই! গুরু কি? গুরুই ভগবান বা ব্রহ্মণ। প্রথমে মানুষ নিজ ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে—পরে সময় আসে যখন সে কোন ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত আর প্রার্থনা করে না—তখন সে প্রার্থনা করে একমাত্র ঈশ্বরের নিমিত্তই। ঈশ্বরই তখন আবির্ভূত হ'ন তার সম্মুখে তার প্রার্থনার উত্তরে যে কোন আকৃতিতে গুরু হিসাবে তাকে পথের সন্ধান দিতে।

গুরু সম্পর্কে মহর্ষি আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন—গুরু তিনি যিনি আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করেছেন। যাহা সকলের আত্মসত্তা তাহাই সদ্‌গুরু। তাঁর কথায়—ঈশ্বর, গুরু ও আত্মসত্তা এক—গুরু তিনি যিনি সর্বসময় আত্মার গভীরে সমাহিত থাকেন—যিনি নিজের এবং সকলের মধ্যে পার্থক্য দেখেন না—যিনি পৃথক সত্তার মিথ্যা মোহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত—গুরু নিজের অন্তরে বিরাজমান—তিনি যে কেবল বাহিরে আছেন এই ভুল ধারণা পরিবর্তনের জন্য ধ্যানের প্রয়োজন।

মিসেস্ এ পিগট্ একজন ইংরাজ মহিলা—অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তিনি মহর্ষির সাধন ইতিহাস ও জীবনী অধ্যয়নে। মহর্ষির দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছেন তিনি। প্রশ্ন করেন তিনি মহর্ষিকে—

প্রঃ—উপলব্ধির নিমিত্ত গুরুর প্রয়োজন আছে কিনা ?

উঃ—শিক্ষা, আলোচনা এবং ধ্যান ধারণা অপেক্ষা সাধন পথে উপলব্ধির জন্য গুরুকৃপা অধিকতর কার্যকরী—প্রথমোক্ত বিষয় সমূহ গৌন কিন্তু শেষোক্ত বিষয়টি মুখ্য ;

প্রঃ—আত্মোপলব্ধির পথে অন্তরায় কি ?

উঃ—বাসনাই আত্মোপলব্ধির পথে প্রধান বাধা ;

প্রঃ—বাসনার নিবৃত্তি কিরূপে করা যায় ?

উঃ—আত্মোপলব্ধির দ্বারা ;

প্রঃ—তাহলে এটি কি একটি পাপ চক্র ?

উঃ—অহং চিন্তাই বাধাস্বরূপ এবং তা সৃষ্টি করে সমস্যার আর তার জন্যই প্রতীয়মান অসঙ্গতির জটিলতায় মানব নিজেই শেষে ফল ভোগ করে। অনুসন্ধান করো কে প্রশ্ন করছে ? তাহলেই আত্মোপলব্ধি সুগম হবে ;

প্রঃ—উপলব্ধি হতে কত সময়ের প্রয়োজন ?

উঃ—একথা জানবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন ?

প্রঃ—আমি যাতে আশার আলোক দেখতে পাই সেইজন্য ;

উঃ—এমন কি এই ইচ্ছাও বাধাস্বরূপ। আত্মা সবার হৃদয়ে চিরজাগরূক—আত্মা ভিন্ন আর কিছু নেই—আত্মায় সমাহিত হও তাহলেই ইচ্ছা বা সংশয় দূর হবে।

অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি হতে এলেন মিষ্টার ইভান্স্ ওয়েনজ্—প্রশ্ন করেন তিনি মহর্ষিকে—

প্রঃ—জ্ঞানীর কি নির্জন স্থানের প্রয়োজন ?

উঃ—নির্জনতা মানুষের মনে—জগতে থেকেও যিনি মনের প্রশান্তি বজায় রাখতে পারেন তিনি প্রকৃতই নির্জনে অবস্থান করেন। অরণ্যে বাস করেও যিনি মনকে সংযত করতে পারেন না—তার ক্ষেত্রে বলা যায় না যে তিনি নিভৃতে বাস করেন। নির্জনতা মনে—যার বাসনা আছে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন নির্জনতা অনুভব করতে পারবেন না। বাসনা রহিত মানুষ সর্বদাই নির্জনে থাকেন ;

প্রঃ—কোন ব্যক্তি কোন কাজে নিযুক্ত থেকেও যদি বাসনা রহিত হ'ন তাহলে তিনি মনের নিভৃতত্ব বজায় রাখতে পারবেন—তাই নয় কি ?

উঃ—হ্যাঁ পারবেন। বাসনার সহিত কার্য বন্ধন স্বরূপ, নিষ্কাম কর্ম—কর্মকর্তাকে বন্ধনে জড়ায় না—সে যখন কাজ করে তখনও সে মনের নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারে ;

প্রঃ—কোন ব্যক্তি কি একজনের অধিক গুরুর স্মরণ নিতে পারেন ?

উঃ—কে গুরু ? আত্মাই গুরু। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মাই প্রকাশ পায় গুরু হিসাবে। গুরু তিনি—যাঁর নিকট হতে শিক্ষা লাভ করা যায়। ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা এক এবং অভিন্ন। অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করেন ঈশ্বর নিখিল বিশ্বচরাচর সর্বত্র সর্বভূতে বিদ্যমান এবং তিনি ঈশ্বরকেই মনে করেন গুরু বলে। পরে ঈশ্বরই তাকে নিয়ে আসেন কোন গুরুর সংস্পর্শে এবং তখন ভক্ত গুরুকেই ইষ্ট বলে মনে করেন—পরে তিনি গুরুর আশীর্বাদে উপলব্ধি করেন আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং চিরন্তন—অন্য সব অলীক। ঐ একই ভাবে উপলব্ধি হয় গুরুই ব্রহ্ম।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর মহাত্মা গান্ধীর নিকট হতে এলেন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ মহর্ষির নিকট তাঁর বাণীর জন্য—উত্তরে মহর্ষি বলেন—

'যখন হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে অনুভব করা যায়—তখন সেখানে কথা অবান্তর'।

ভারতের এক করদরাজ্যের মহারাণী সাহেবা এলেন মহর্ষির দর্শনে—শ্রীভগবানের চরণে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন করে নিবেদন করলেন তিনি—

শ্রীভগবানের দর্শনে আমি ধন্য, আমার চক্ষু সার্থক। পৃথিবীতে মানুষের যা কিছু কাম্য আমি তার সবেরই অধিকারী—মান, সম্ভ্রম, ধন সম্পদ সকলই—কিন্তু আমার মনে কোন শান্তি নেই—এ বোধ হয় আমার কর্মফল বা প্রারব্ধ ;

কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর উত্তরে মহর্ষি বলেন—

প্রারব্ধ কি ?—নিঃশেষে সমর্পন করো নিজেকে ঈশ্বরের নিকট —তাহলে শান্তি পাবে। তাঁর ওপর সব ভার সব দায়িত্ব ছেড়ে দাও—নিজের ওপর কোন ভার রেখো না—তাহলে প্রারব্ধ ভোগ হবে না ;

মহারাণী—নিজেকে নিঃশেষে সমর্পন করা কি সম্ভব ?

মহর্ষি—প্রথমে হয়ত সম্ভব নয়—কিন্তু আংশিক ভাবে নিজেকে সমর্পন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব—আর কালে তা হতে হবে পূর্ণ সমর্পন ;

মহারাণী—অতীতের কর্মফলেই তো প্রারব্ধ ভোগ—তাহলে তা কি করে এড়ান যাবে ?

মহর্ষি—যদি কেউ ভগবানে সমর্পিত মন হয় তাহলে ভগবান তার বোঝা বইবেন ;

মহারাণী—প্রারব্ধ ভোগ যদি ভগবৎ ইচ্ছায় হয় তাহলে ভগবান কি করে তার অন্যথা করবেন ?

মহর্ষি—তাঁর ইচ্ছায় সবই সম্ভব।

জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন—

প্র ঃ—আমি সংসারে থেকেও কি অধ্যাত্ম পথে সাধনা করতে পারি ?

উ ঃ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই—প্রত্যেকেরই তা করা উচিত ;

প্র ঃ—জগৎ কি সাধনার অন্তরায় নয় ? সকল ধর্মগ্রন্থই কি সংসার ত্যাগের কথা বলে না ?

উ ঃ—জগৎ সংসার তোমার মনের সৃষ্টি। জগৎ বলে না যে আমি জগৎ—তা যদি হ'ত তাহলে নিদ্রাকালেও জগতের অস্তিত্ব থাকত। যেহেতু নিদ্রাকালে জগতের উপলব্ধি হয় না সেই হেতু জগৎ অস্থায়ী। একমাত্র আত্মসত্তাই স্থায়ী। আত্মসত্তার বোধই জ্ঞান —অজ্ঞানতা দূর হওয়াই প্রকৃত সংসার ত্যাগ।

অন্য একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন—

প্র ঃ—কিরূপে আত্মোপলব্ধি করা যায় ?

উ ঃ—আত্ম সত্তার উপলব্ধি নূতন করে করার কিছুই নাই—উহা সবার ভিতরে সব সময়ই আছে—যা প্রয়োজন তা হচ্ছে—উপলব্ধি হয়নি এই চিন্তা হতে মুক্ত হওয়া। চিন্তাশূন্য মন বা শান্তিই উপলব্ধি।

অপর একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন—

প্র ঃ—মোক্ষ লাভ করতে হলে কি করা প্রয়োজন ?

উ ঃ—আগে জান মোক্ষ কি ?

প্র ঃ—মোক্ষ লাভের জন্য কি উপাসনা করব ?

উ ঃ—চিত্তনিরোধ এবং মন সংযোগের জন্য উপাসনা প্রয়োজন ;

প্র ঃ—মূর্তি উপাসনায় কি কোন ক্ষতি আছে ?

উঃ—যতক্ষণ 'আমি দেহ' এই ভাব মনে থাকবে ততক্ষণ কোন ক্ষতি নেই ;

প্রঃ—মোক্ষ লাভের জন্য গৃহ, সম্পদ, পত্নী সবই কি পরিত্যাগ করা উচিৎ ?

উঃ—এমন বহু মানুষ আছেন যাদের সংসারে বাস করেও উপলব্ধি হয়েছে—আগে অনুসন্ধান কর 'কে তুমি' ;

প্রঃ—আমি মূর্তি উপাসনা করি ;

উঃ—তাই করে যাও, এতে মনসংযোগ আসবে। একাগ্র হওয়ার চেষ্টা কর—ক্রমে সব আসবে। মানুষ মনে করে মোক্ষ কোথাও দূরে আছে—এবং তা খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু তা ভুল। নিজের ভিতরে আত্মসত্তাকে জানার অর্থই মোক্ষ লাভ করা। একাগ্রমনা হও তাহলেই সব পাবে।

আমেরিকার অধিবাসী মিঃ জে, এম, লোরে দু'মাস শ্রীরমণাশ্রমে বাসের পর বিদায় গ্রহণের সময় নিবেদন করেন মহর্ষিকে—

'আজ রাত্রেই আশ্রম ছেড়ে যাচ্ছি—এখান থেকে যেতে আমি কষ্ট বোধই করছি—কিন্তু আমাকে যেতেই হবে ফিরে আমেরিকায়,

যাবার সময় পাথেয় হিসাবে চাইছি গুরুদেবের বাণী। গুরুদেব আমার নিজের চেয়ে আমাকে বেশী জানেন—দূরে যখন থাকব তখন অনুপ্রেরণার জন্য তাঁর বাণীর প্রয়োজন;

মহর্ষি উত্তরে বলেন—গুরু তোমা থেকে ভিন্ন নন্—তিনি তোমার অন্তরে আছেন—তিনিই আত্মসত্তা—এই প্রকৃত সত্য বলে জানবে। অনুসন্ধান করো তাঁকে অন্তরে—তাহলেই তাঁকে পাবে—তোমার সহিত তাঁর চিরমিলন ঘটবে। সেখানেই পাবে তুমি বাণী। গুরু কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন না—আর তুমিও গুরু হতে দূরে সরে যেতে পার না। যে গুরুর আশীর্বাদ পেয়েছে সব সময়ের জন্য গুরুই তাকে রক্ষা করবেন।

আশ্রমবাসী জনৈক শিষ্য মহর্ষিকে বলেন যে, যে কোন অবস্থায় শ্রীভগবানের দৈহিক উপস্থিতির সান্নিধ্যেই তিনি আশ্রমে বাস করতে চান চিরকাল।

উত্তরে মহর্ষি বলেন—

"তোমার ভিতরে যে আধ্যাত্মিক প্রাণী বাস করে সেই প্রকৃত ভগবান—এইটাই তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে।"

দক্ষিণ ভারতের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলা শোকার্ত চিত্তে এলেন শ্রীভগবানের নিকট—যাচিঞা করলেন তাঁর আশীর্বাদ যেন তিনি ফিরে পান মনের শান্তি। উত্তরে মহর্ষি বলেন—"ভক্তিমতী হও তাহলে তোমাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

আবার প্রশ্ন করেন তিনি—

প্রঃ—কি করে ফিরে পাব মনের শান্তি?

উঃ—ভগবানে আত্মসমর্পণ করে;

প্রঃ—আমি কি ভক্তিমতী হতে পারব?

উঃ—প্রত্যেকেই তা হতে পারে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সবারই হতে পারে—কেউ সে শক্তি হতে বঞ্চিত নয়—তা সে বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ যেই হোক না কেন;

প্রঃ—আমি যুবতী এবং গৃহিনী—গৃহস্থধর্মে আমার কর্তব্য

আছে। এই অবস্থার সহিত সাধনার কি সঙ্গতি থাকতে পারে ?

উঃ—নিশ্চয়। কে তুমি ?—তুমি দেহ নও—তুমি মন নও—তুমি পূর্ণ চৈতন্য। তোমার আত্মসত্তায় অবস্থানের বাধা কি ?

প্রঃ—কিন্তু গৃহস্থধর্মের সঙ্গে আত্মানুসন্ধানের সঙ্গতি আছে কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ দূরীভূত হচ্ছে না ;

উঃ—তোমার আত্মসত্তা সর্বসময়েই তোমার ভিতরে আছে—তুমিই আত্মসত্তা—তাহা তোমার বাহিরে নয়—সেজন্য সঙ্গতি আছে কি নেই এ প্রশ্ন অবান্তর ;

প্রঃ—আমি এ সম্পর্কে আরও নিঃসন্দেহ হতে চাই। আমার সন্তান সন্ততি আছে। আমার বালক ব্রহ্মচারী পুত্রের সাতমাস পূর্বে অকাল মৃত্যু হয়েছে—শোকে অভিভূত হয়েছি আমি—জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছি—চেয়েছিলাম আমি আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ লাভ করতে কিন্তু গৃহিনী হিসাবে আমার কর্তব্য দেয়নি আমাকে সংসার হতে অবসর গ্রহণ করতে—এই কারণেই আমার সন্দেহ ;

উঃ—অবসর গ্রহণের উদ্দেশ্য—আত্মসমাহিত হওয়ার জন্য—এর বেশী কিছু নয়—এ একপ্রকার পরিবেশ পরিত্যাগ পূর্বক অন্য পরিবেশে অবস্থান নয় কিম্বা এই স্থূল জগৎ পরিত্যাগ পূর্বক মানসিক জগতের বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ নয়। ঘুমের অবস্থা কল্পনা কর—তখন কি তুমি কোন ঘটনার কথা জানতে পার ? যদি জগৎ বা পুত্র প্রকৃত হ'ত তাহলে কি তোমার ঘুমের ভিতরেও তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে না ? ঘুমের ভিতরে তোমার নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পার না—তুমি তখন সুখী একথাও অস্বীকার করতে পারনা। তুমি সেই মানুষই এখন জাগ্রত অবস্থায় সন্দেহ প্রকাশ করছ। তোমার মতে তুমি এখন সুখী নও কিন্তু নিদ্রাবস্থায় তুমি সুখী ছিলে। এর মধ্যে কি এমন ঘট্‌ল যাতে করে নিদ্রাবস্থার সুখ অন্তর্হিত হ'ল ? ইহা আর কিছু নয়—অহং ভাবের প্রকাশ—জাগ্রত অবস্থায় এ নূতন উপসর্গ।

নিদ্রায় অহং জ্ঞান থাকে না। অহং জ্ঞানের জন্ম হতে ব্যক্তির জন্ম। অপর কোনরূপ জন্ম নেই। যা জন্মাবে তার বিনাশ হবেই। অহং ভাবের শেষ কর—যার একবার বিনাশ হবে তার আর পুনঃ পুনঃ বিনাশের ভয় নেই। অহং জ্ঞানের শেষ হলেও আত্মসত্তা ঠিকই থাকে—তাহাই আনন্দ—তাহাই শাশ্বত ;

প্রঃ—কিরূপে তা সাধন করা যাবে ?

উঃ—কিসের জন্য এই সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে—কে সন্দেহকারী ? —কে চিন্তাকাবী ? ঐটাই অহং ভাব—ওকে বাড়তে দিওনা—অন্য সব চিন্তারও তাহলে শেষ হবে—এবং যা থাকবে তাহাই একমাত্র সত্য—উহাই পূর্ণ চৈতন্য ;

প্রঃ—এ খুবই কঠিন মনে হচ্ছে—আমি কি ভক্তি মার্গে অগ্রসর হতে পারিনা ?

উঃ—ইহা ব্যক্তিগত স্বভাব এবং প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে। ভক্তি ও বিচার একই ;

প্রঃ—আমি যা বলতে চেয়েছি তা ধ্যান ধাবণা প্রভৃতি ;

উঃ—হাঁ, কোন মূর্তিব ওপব ধ্যান হতে পাবে—উহা অন্য চিন্তাসমূহ দূর করে—ঈশ্বরেব জন্য একমুখী চিন্তা অন্য সকল চিন্তাকে দমিত করে—ইহাই মনঃসংযোগ। সেজন্য ধ্যানের উদ্দেশ্য এবং বিচারের উদ্দেশ্য একই ;

প্রঃ—আমরা ঈশ্বরকে কি বিশিষ্ট আকারে দেখতে পারি না ?

উঃ—হাঁ, ঈশ্বরকে মনে দেখা যায়। বিশিষ্ট আকাবেও দেখা যেতে পারে—কিন্তু তা ভক্তের মনে। ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ এবং আকৃতি ভক্তের মনে অনুভূত হয়—কিন্তু উহাই শেষ নয়—উহাতে দ্বৈতভাব আছে।

উহা স্বপ্ন দর্শনের ন্যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর হতেই বিচারের আরম্ভ—এবং তাহার পবিণতি আত্মসত্তার উপলব্ধিতে—বিচারই শেষ পথ। কেউ কেউ বিচারের পথ বাস্তব বলে মনে কবে—অন্যেরা ভক্তি মার্গ সহজ বলেই ধারণা করে ;

প্রঃ—মিঃ ব্রান্টন্ কি মহর্ষিকে লণ্ডনে দেখেন নি? উহাও কি স্বপ্ন?

উঃ—হাঁ—তার স্বপ্নদর্শন হয়েছিল--মানস নেত্রে আমাকে দেখেছিল;

প্রঃ—আপনাকে কি এই স্থূল দেহে দেখেনি?

উঃ—হাঁ দেখেছিল—কিন্তু তাও মনে;

প্রঃ—আমি কি প্রকারে আত্মসত্তায় পৌঁছিতে পারি?

উঃ—আত্মসত্তায় পৌঁছানর কোন প্রশ্নই ওঠে না। যদি আত্মসত্তায় পৌঁছিতে হয় তাহলে তার অর্থ এই হয় যে আত্মসত্তার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই—তাকে নতুন করে পেতে হবে। যাকে নতুন করে পাওয়া যায় তা হারিয়েও যায়—কাজেই তা অস্থায়ী। যা স্থায়ী নয় তাকে পাওয়ার চেষ্টা মূল্যহীন। সেই কারণেই আমি বলি আত্মসত্তায় পৌঁছানর কোন কথাই ওঠে না। তুমিই আত্মসত্তা—তুমি এখনও তাই। ঘটনা এই যে তুমি নিজে তোমার আনন্দময় অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। অজ্ঞানতার আবরণে তোমার আনন্দময় চৈতন্য আবৃত হয়ে রয়েছে। চেষ্টা করো যাতে এই অজ্ঞানতা দূর হয়। অজ্ঞানতা হতে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়—ভ্রান্ত ধারণা হতে আত্মসত্তার সহিত দেহ মন প্রভৃতির অলীক অভিন্নতা প্রতিপাদন হয়—এই মিথ্যা প্রতিপাদন দূর হলে যা থাকবে তাই প্রকৃত চিন্ময় সত্তা;

প্রঃ—কি করে তা দূর হবে?

উঃ—আত্মানুসন্ধানের দ্বারা;

প্রঃ—এ খুব কঠিন—আমি কি আত্ম উপলব্ধি করতে পারব?

উঃ—তুমিই আত্মসত্তা—সেইজন্য উপলব্ধি বোধ আসা সবার পক্ষেই সমান সহজ সাধ্য। উপলব্ধি—প্রার্থীদের মধ্যে পার্থক্য করে না। 'আমি কি পারব?' এই সন্দেহ বা 'আমি উপলব্ধি করি নাই' এই ভাবই বাধা স্বরূপ—এই সকল দ্বিধা ও সন্দেহ হতে মুক্ত হও।

মিঃ গ্র্যাণ্ট ডাফ সত্তর বৎসর বয়স্ক অভিজাত ইংরাজ কবি ও গ্রন্থকার এবং মাদ্রাজের ভূতপূর্ব ইংরাজ গভর্ণরের ভ্রাতুষ্পুত্র—তিনি এলেন মহর্ষির দর্শনে; যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন বলে স্থির নিশ্চয় হয়ে এসেছিলেন তিনি—মহর্ষির সান্নিধ্যে আপনা হতেই তার সমাধান হয়ে যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন মহর্ষিব সহিত তাঁর প্রথম দর্শনেব অভিজ্ঞতা—"প্রথম যখন আমি সাক্ষাৎ করি মহর্ষির সঙ্গে—জানি না কি ঘটেছিল তখন—কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি চাইলেন আমার দিকে সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম আমি—তিনিই সত্য—তিনিই আলোক।"

"অতীতে বহু বৎসর ধরে যে সন্দেহ এবং জল্পনা কল্পনা আমার মনের নিভৃত কক্ষে জমেছিল তাঁর মহান আত্মাব করুণা রশ্মিতে বিলুপ্ত হয়ে গেল সব চিরতরে। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে হামফ্রির যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল মহর্ষিব সান্নিধ্যে বসে তা ইউরোপবাসীদের পক্ষে খুবই চিত্তাকর্ষক—হামফ্রির শেষ কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—'ইহা সত্যই বিস্ময়কর তাঁর সান্নিধ্য কি পার্থক্যই না সৃষ্টি করে।' অরুণাচলের ঋষির নিকট উপস্থিত হতে পারা আমারও জীবনের প্রধানতম ঘটনা।"

দক্ষিণ ভারতের কোন এক সহরেব বিখ্যাত ব্যবহারজীব শ্রীএন্ নটেশন আয়ার নিবেদন করেন মহর্ষিকে—

প্রঃ—গুরুদেব, আমি ভগবানে বিশ্বাসী তথাপি আমি উৎসাহ পাইনা—মনের দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তা আমার মনঃসংযোগের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে;

উঃ—ঠিকমত প্রাণায়ামের অভ্যাসে তোমার শক্তি বৃদ্ধি পাবে;

প্রঃ—আমাব ব্যবহারিক জীবনে কাজ আছে তথাপি সর্বসময় আমি কাজের মধ্যেও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে চাই—এই উভয় বিষয় কি পরস্পর বিরোধী হবে?

উঃ—না, কোন বিরোধ হবে না—যথাযথ অভ্যাসে তোমার

শক্তি বৃদ্ধি পাবে—উভয় বিষয়ই একসঙ্গে করতে পারবে—তোমার কাজকে তখন দেখবে—যেমন তুমি স্বপ্ন দেখ।

জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন—

প্রঃ—আমি অতিশয় অস্থির চিত্ত—আমাব কি করণীয় ?

উঃ—কোন কিছুর ওপর মনঃসংযোগ কর আর তাই ধরে থাক তাহলেই পরিণামে সব ঠিক হবে ;

প্রঃ—মনঃসংযোগ আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর ;

উঃ—অভ্যাস করে যাও—পরে দেখবে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তা' সহজ হবে ;

প্রঃ—আমাব কি যোগের প্রয়োজন নেই ?

উঃ—যোগ মনঃসংযোগের পথ ভিন্ন অপব কিছু নয় ;

প্রঃ—ঈশ্বর দর্শন কি সম্ভব ?

উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—তুমি এটা ওটা অনেক কিছুই দেখ—ঈশ্বর কেন দেখবে না ? তোমাকে জানতে হবে ঈশ্বরেব স্বরূপ। সকলে সব সময়ই ঈশ্বরকে দেখছে কিন্তু তারা তা' জানে না। আগে জান ঈশ্বর কি ? মানুষ দেখেও দেখে না কারণ সে ঈশ্বরকে জানে না ;

প্রঃ—ভগবানেব মূর্তি উপাসনা কালে আমি কি কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি নাম জপ করতে পারি ?

উঃ—মন্ত্র জপ খুবই কার্যকরী—ধ্যানে তা' সাহায্য কবে—বারংবার জপে মন একীভূত হয় ঐ নামেব সঙ্গে—আর তাবপরে উপলব্ধি হয় প্রকৃত ধ্যান কি ;

প্রঃ—ভগবৎ উপাসনা ব্যতীতও কি গুরুব নির্দেশ প্রয়োজনীয় নয় ?

উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঈশ্বর নিজেই তোমার গুরু হতে পারেন—কে গুরু হবেন তাতে আসে যায় না—শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমরা প্রকৃতই ঈশ্বব ও গুরুব সহিত এক এবং অভিন্ন—গুরুই ঈশ্বর—মানুষগুরু এবং ঈশ্বরগুরুতে কোন প্রভেদ নেই ;

প্রঃ—পুণ্য কাজ করলে কি তার ফল পাওয়া যায় ?

উঃ—হ্যাঁ—তা' সাহায্য করবে তোমার প্রারব্ধকে ;

প্রঃ—পথেব সন্ধানে গুরুর সাহায্য কি খুবই কার্যকরী ?

উঃ—তোমার হৃদয়ের প্রজ্বলিত আলোকে কাজ করে যাও—আপনিই দর্শন মিলবে গুকর—গুরুও নিজেই তোমাকে খুঁজে নেবেন ;

প্রঃ—জ্ঞান ও ভক্তি পথে কি কোন পার্থক্য আছে ?

উঃ—জ্ঞান ও ভক্তি মার্গ এক এবং অভিন্ন। ভক্তি মার্গে যেমন আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি আসে ঠিক তেমনই জ্ঞান মার্গে বিচারের পথে আসে উপলব্ধি। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনের অর্থই অহং চিন্তার অবসান—তাতে সমস্ত ধুয়ে মুছে মানুষ হয় সংস্কার মুক্ত। উভয় পথেবই শেষে মানুষ আর পৃথক সত্তায় অবস্থান কবে না।

ডান্‌কান্ গ্রিন্‌লীস্, এম, এ (অক্সন) মহর্ষিকে নিবেদন কবেন—গত অক্টোবব মাসে এখানে শ্রীভগবানের নিকটে থাকতে হৃদয়ে যে শান্তি লাভ কবেছিলাম, এই আশ্রম হতে যাওয়ার দশ দিন পব পর্যন্তও তা আমাব সমস্ত সত্তাতে পরিব্যাপ্ত ছিল—এ আমি তখন স্পষ্টই অনুভব কবতাম। কাজে ব্যস্ত থাকলেও সব সময়ই বয়ে যেত শান্তিব ফল্গুধারা আমার অন্তবে—অনুভব কবতাম একত্ব। তারপবে আমাব নীরস কার্যকালে উহা বোধ হতে থাকে আধ-ঘুম অবস্থায় দ্বৈত চৈতন্যের ন্যায়—পবে তা'ও অন্তর্হিত হয় সম্পূর্ণরূপে—আর সেই সঙ্গে পুনবায় পকাশ পায় আমাব পুবাতন জড়-বুদ্ধি। আমাব কর্ম—ধ্যানের নিমিত্ত পৃথক সময় দেয় না। যখন কর্মে নিবিষ্ট থাকি তখন কি 'আমি শাশ্বত' এই কথা নিরন্তর স্মরণ পূর্বক উহার অনুভবের প্রচেষ্টা যথেষ্ট ?

উত্তবে মহর্ষি বলেন—যখন তোমার মন শক্তিশালী হবে তখন উহা স্থায়ী হবে। পুনঃপুনঃ অভ্যাসে মন হয় শক্তিশালী ; তখন মন ঐ ধারাকে বহন করতে হয় সক্ষম—সে অবস্থায় কর্মে ব্যাপৃত

থাক বা না থাক সব সময়ই ঐ ধারা তোমার অন্তরে বিরাজ করবে অক্ষত এবং বিরামহীনভাবে।

আবার প্রশ্ন করেন গ্রীন্‌লিস্‌—তখন কি পৃথক ধ্যানের আর প্রয়োজন নেই ?

শ্রীভগবান বলেন—ধ্যান কি ? ধ্যানই তোমার প্রকৃত স্বরূপ—তুমি একে ধ্যান বল কারণ এ ছাড়াও তোমার আছে অন্য চিন্তা-সমূহ যা তোমার মনকে বিক্ষিপ্ত করে। যখন ঐ সকল চিন্তা দূব হয় ও চিন্তাশূন্য থাক—অর্থাৎ চিন্তাশূন্য হয়ে ধ্যানাবস্থায় থাক—তখনই প্রকাশ পায় তোমার প্রকৃত স্বভাব—এ সেই অবস্থা যা তুমি এখন লাভ করতে চাইছ অন্য চিন্তা সমূহ দূরে রেখে। যখন তুমি ধ্যান কর তখন তোমার অন্য চিন্তাসমূহ ভিড় কবে আসে—এমন কি তোমাব ভিতবে যে চিন্তা ছিল লুক্কায়িত তারও বহিঃপ্রকাশ হয়। ঐ চিন্তাসমূহ উদয় না হলে কিরূপে তাদের ধ্বংস সাধন হবে ?—সেজন্য তারা স্বয়ংই উত্থিত হয় ধ্বংসের নিমিত্ত—ক্রমে চিন্তাসমূহ দূর হয় এবং মন হয় শক্তিশালী।

বিশ্বশান্তি সংসদের প্রতিনিধি মিসেস্‌ রুর্‌ণা জেনিংস্‌ জিজ্ঞাসা করেন মহর্ষিকে—কি উপায়ে সমস্ত বিশ্বে শান্তি প্রসার লাভ করবে ?

উত্তরে শ্রীভগবান বলেন—যদি মানুষ নিজ সত্তায় শান্তি অনুভব করে তাহলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যতীতই তাহা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে।

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলেন—সকল প্রকার পাপ ও দুঃশীলতা মানবীয় মিথ্যা ধারণা হতে জন্মগ্রহণ করে—যে ধাবণা মানুষকে তার দেহের সঙ্গে সনাক্ত করায়। এমন কোন পাপ নেই যার ভিতর স্বার্থপবতা এবং ‘আমি দেহ’ এই বোধ আবিষ্কার করা যাবে না। প্রত্যয় লাভ কর আমি দেহ নই আমি শাশ্বত আত্মন্‌—সাময়িকভাবে মাত্র আমি এই রক্তমাংসের খোলসের মধ্যে অবস্থান করি। আত্ম জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য সমগ্র মনকে তার

উৎসে নিবদ্ধ করা বা অন্তর্মুখীন করা। ধ্যানে বসে জিজ্ঞাসা করবে —'আমি কে?' আর সেই সঙ্গে সমগ্র মনকে দৃঢ় নিবদ্ধ করবে হৃদয়ে—তাহলেই ধীরে ধীরে আসবে উপলব্ধি।

জয়ন্তী উৎসব

১৮৯৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর—এইদিন বালক বেঙ্কটবমণ প্রথম এসেছিলেন তাঁর মানস নেত্রে দেখা অরুণাচলের পবিত্র ক্ষেত্রে—যার নাম উচ্চাবণ মাত্র অনুভূতি জেগেছিল তার হৃদয়ে—অধ্যাত্ম পথের প্রথম দীক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি। এইদিন হতে সুদীর্ঘ কাল ধরে অরুণাচলের মন্দিরে ও তাব অলিন্দে, গহ্বরে, প্রাঙ্গণে, পথিপার্শ্বে—পর্বতোপরে, গিরিশৃঙ্গে, গুহায়, আশ্রমে এবং পর্বত-পাদদেশে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান সাধনা তপস্যা ও সমাধিলাভে বালক বেঙ্কটরমণ ভগবান রমণ মহর্ষিতে পরিণত হয়ে জগতের আর্ত, মুমুক্ষু ও মুক্তিকামী মানবকে করেছেন অনুপ্রেরণা দান—মুক্তিপথের কাণ্ডাবী হয়েছেন তিনি।

তাঁর সাধন এবং লীলাভূমি অরুণাচলের পবিত্র ক্ষেত্রে এই সুদীর্ঘসময় দেশ কাল ধর্ম নির্বিশেষে সন্ন্যাসী, সাধক, ভক্ত, গৃহী—পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানবকে ভগবৎ প্রাপ্তির সোজা সরল পথের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি—সৃষ্টি করেছেন তাদের হৃদয়ে দুর্জয় দুর্নিবার ইচ্ছা ভগবৎ উপলব্ধির—এতে নেই ধর্মান্ধতা, শাস্ত্রের জাল, আচারের কাঠিন্য—বর্তমান জাগতিক পরিবেশে কর্মের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থান করেও—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—যে যে পথে ঈশ্বর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চায়, তাকে সেই পথেই অগ্রসর করিয়েছেন তিনি।

শ্রীরমণ মহর্ষির অরুণাচলের পবিত্র উপস্থিতির স্মরণার্থে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য তাঁর অগণিত শিষ্য, ভক্ত ও

অনুরক্তজন আয়োজন করেন ১৯৭৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর তিরুভান্নমালয়ে আগমনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদিনের তরেও তাঁর লীলাভূমি অরুণাচল পরিত্যাগ করেননি তিনি—মানব ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

পৃথিবীর সর্বদেশ হতে তাঁর অগণিত শিষ্য, ভক্ত, অনুরক্ত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা এসে সমবেত হন এই দিনে শ্রীরমণ আশ্রমে মহর্ষির চরণ প্রান্তে—অন্তরের আকুল ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁর পাদপদ্মে। যারা এসে উপস্থিত হতে পারেননি এই স্মরণীয় দিনে—দূর হতে তারাও জানিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রীভগবানের চরণে—যাচিঞা করেছেন তাঁর আশীর্বাদ।

যদিও শ্রীভগবানের নিকট এই উৎসব আয়োজনের কোনই সার্থকতা নেই—ভগবৎ চৈতন্যে ডুবে আছেন তিনি সর্ব সময়ে সহজ সমাধি অবস্থায়—কিন্তু শিষ্য ও ভক্তজনের জীবনে এ এক স্মরণীয় দিন। পৃথিবীর সর্বদেশের জ্ঞানী গুণী ভক্তেরা এসে মিলিত হয়েছেন এই উপলক্ষে—বর্ণনা করেছেন তাঁরা নিজ নিজ জীবনের সরস অভিজ্ঞতা ও সাধন ইতিহাস বা মহর্ষির সান্নিধ্যে তাদের অনুপ্রেরণা ও উপলব্ধির কথা—মহর্ষির উজ্জ্বল ভাস্বর জীবনবেদ হয়েছে পরিস্ফুট সবার হৃদয়ে—উপকৃত হয়েছেন একে অপরের অভিজ্ঞতায়—জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করে ফিরে গেছেন যে যার স্থানে। এই উপলক্ষে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"যদি পৃথিবীকে বাঁচতে হয় তাহলে সৃষ্টি করতে হবে নূতন জগৎ—সে জগৎ হবে উচ্চতম সত্যের এবং জ্ঞানের জগৎ—এই জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন না করতে পারার জন্যই মানবের এই দুঃখ কষ্ট। শ্রীরমণ মহর্ষি আমাদের এই বৃহত্তম সত্যের প্রতি আকর্ষণ করেছেন।"
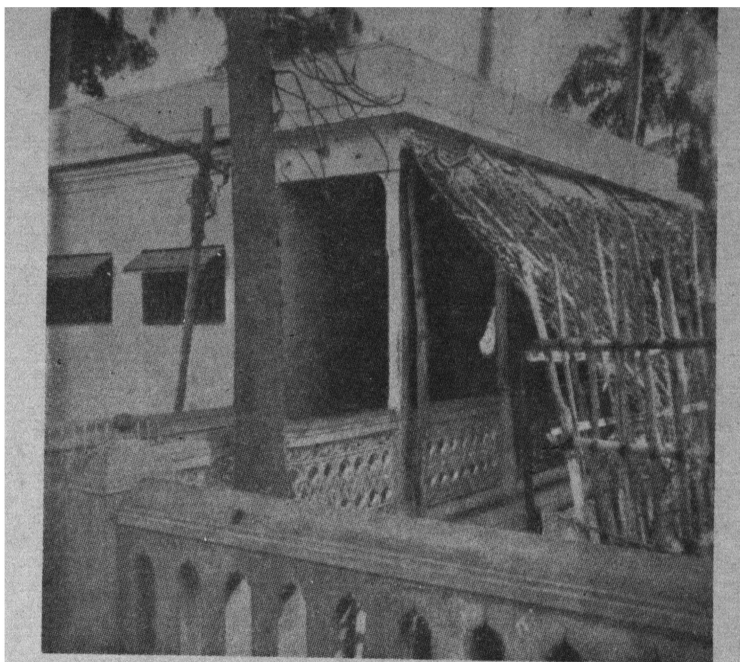
শ্রীভগবানের শেষ আবাসস্থান:
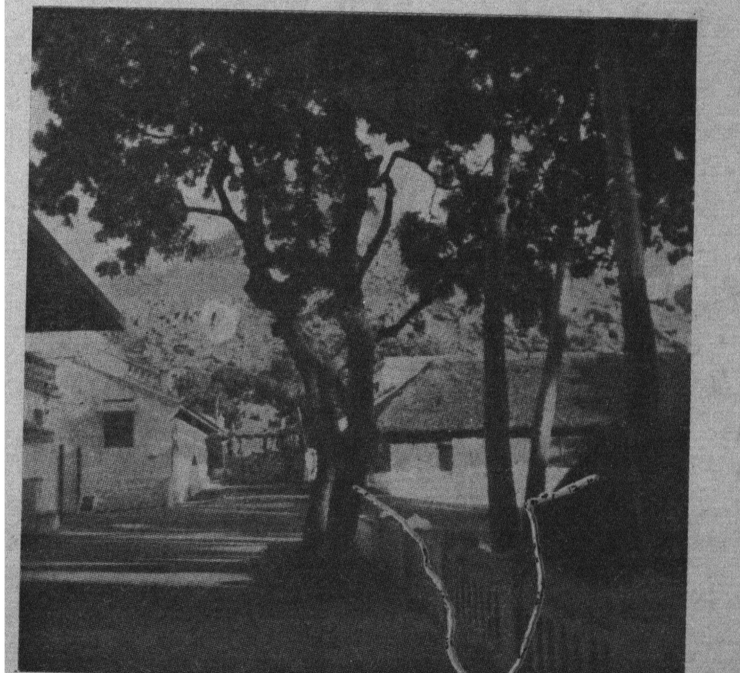
মহাসমাধি

শ্রীভগবান চিরদিনই উদাসীন তাঁর নিজের শরীর সম্পর্কে—যখনই কোন শিষ্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এ বিষয়ে, তিনি বলেছেন—তোমরা শ্রীভগবান বলতে এই দেহকেই মনে কর আর সেইজন্যই ভগবানের যন্ত্রণাভোগ দেখ—এ খুবই দুঃখের বিষয়।

জয়ন্তী উৎসবের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের প্রথম হতেই মহর্ষির শরীরের বিষয়ে আশ্রমবাসী সকলেই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর দুই পা বাতে আক্রান্ত হয়—শুধু তাই নয় পিঠ ও কাঁধেও তিনি ব্যথা অনুভব করেন—সাধারণ দুর্বলতাও প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি গ্রাহ্যই করেন না এ সকল বিষয় এবং দেহের কোনরূপ পরিচর্যার প্রয়োজনও অনুমোদন করেন না। চিকিৎ-সকেরা রোগ নিরাময়ের জন্য ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা করেন কিন্তু তাঁর প্রচলিত প্রথানুযারী সকলের জন্য যে ব্যবস্থা তার বাহিরে নিজের প্রয়োজনে কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধী হন তিনি।

বয়সের তুলনায় বৃদ্ধই দেখাত তাঁকে—প্রথম যৌবনে দেহবোধ বিরহিত অবস্থায় নিরন্তর সমাধি মগ্ন থাকায় দেহের প্রতি তাঁর চরম উদাসীনতার ফল প্রকাশ পায়, তার ওপর নিজ করুণায় ও মাহাত্মে কত শত আর্ত ও দুঃখীর দুঃখ নিবারণার্থে তাদের বোঝা নিয়েছেন নিজ স্কন্ধে—কত রোগীর রোগ ভোগ ও যন্ত্রণা নিয়েছেন নিজ শরীরে তাই ভক্তেরা মনে করেন সে সকলই প্রকাশ পায় তাঁর শরীরে এই সময় হতে।

১৯৪৯ সালের প্রথমভাগে তাঁর বাঁ হাতের কনুইয়ের নীচে ছোট্ট স্ফোটকের আকারে আবের মত উঁচু হয়ে ফুলে ওঠে—এ হতে কোন কিছু ভারী অসুখ হতে পারে একথা কেউই মনে করেননি তখন। আশ্রম চিকিৎসক কেটে দিলেন সেই স্ফোটকটা, ফেব্রুয়ারী মাসে

এক মাসের মধ্যে আবার দেখা দিল সেটী বর্ধিত আকারে ও যন্ত্রণা-দায়করূপে। চিকিৎসকগণ নির্ণয় করেন তা উৎকট আব বা ম্যালিগ্‌ন্যান্ট টিউমার বলে।

মার্চের শেষে মাদ্রাজ থেকে এসে পৌঁছিলেন একজন বিজ্ঞ শল্য চিকিৎসক তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে। আশ্রমের সবাই শুনলেন ডাক্তারের অভিমত—টিউমার নির্মূল করা প্রয়োজন। পরদিন প্রাতে মহর্ষিকে দেখা গেল না তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। সকলেই উদ্বিগ্ন—কারো মুখে কোন কথা নেই—মৌন ধ্যানে শ্রীভগবানের নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করেন সবলে। দুপুরে অস্ত্রোপচার হ'ল—সেদিন সন্ধ্যায় খুবই দুর্বলতা অনুভব করেন মহর্ষি—সক্ষম হন না আশ্রম চিকিৎসা ভবন পরিত্যাগ করতে—কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিপ্রায় জানান সাধনভবনে ভক্তদের মাঝে যাওয়ায় জন্য। ঐরূপ শারীরিক অবস্থায় সাধন ভবনে যাওয়ার অনুমতি দেন না চিকিৎসকগণ। চিকিৎসা ভবনের অলিন্দে বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে আরাম কেদারায়—সঙ্গে থাকেন বিজ্ঞ চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীগণ—ভক্ত শিষ্যগণ সামনের মুক্তপ্রাঙ্গণে আকুল আগ্রহ নিয়ে তাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গুরুদেবের জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছিলেন—এইবারে মহর্ষির নির্দেশে এক একজন করে এগিয়ে এসে কয়েক ধাপ উঠে দর্শন করেন শ্রীভগবানকে—মৌন মুক হয়েই নিবেদন করেন মহর্ষিকে তাদের হৃদয়ের পরম শ্রদ্ধা—মনে মনে প্রার্থনাও জানান পরম পিতার নিকট তাঁর আরোগ্য লাভের নিমিত্ত।

এত যে যন্ত্রণা এত যে কষ্ট কিন্তু মুখে তার আভাষ মাত্র নেই—শীর্ণ মুখখানি কিন্তু শান্ত সমাহিত—আননের চারিদিক ঘিরে জ্যোতিঃচক্র—করুণাধারা যেন উপ্‌ছে পড়ছে—সেই অপূর্ব প্রাণস্পর্শী স্বর্গীয় ছবি সারা মন প্রাণভরে দেখার পূর্বেই বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয় অন্যকে দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য—যাতে কেউ না বঞ্চিত হয় এ অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে।

পরদিন অল্প সময়ের জন্য তাঁকে আসতে দেওয়া হয় সাধন-ভবনে—তারপর একটু একটু করে সময় বাড়িয়ে আবার তিনি নিয়মানুযায়ী আগের মতই কাটাতে থাকেন সাধনভবনে ধ্যান ধারণায়—দর্শনও দেন দিবা রাত্রের সব সময়ই ভক্ত শিষ্য আগত-জনকে—কারো নিষেধই মানেন না তিনি এ সকল বিষয়ে। যোগী রামিয়া আশ্রমেই আছেন গত দু'মাস হতে তাঁর প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের কাছে কাছে তাঁর দেহের সঙ্কটকালে। শ্বেত বস্ত্র পরিহিত সাধক ও যোগী রামিয়া মৌন ধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন মহর্ষির সান্নিধ্যে—শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তাঁরই ইষ্টের শ্রীচরণে।

ক্ষত তখনও পুরাপুরি শুকায় নি—আবার দেখা দিল টিউমার—উঁচু হয়ে বাড়তেও থাকে তা'। পরামর্শ দিলেন চিকিৎসকগণ তাঁর বাম হাত কেটে বাদ দেওয়ার জন্য। জ্ঞানীর দেহ কি বিকৃত হতে পারে? অসম্মতি জানান শ্রীভগবান এ প্রস্তাবে—বলেন তিনি, আতঙ্কের কোনই কারণ নেই—দেহ তো রোগেরই আকর—তার যা স্বাভাবিক পরিণতি সেই দিকেই যেতে দাও তাকে—কেন তাকে অনর্থক বিকৃত করবে? আবার আশার কথাও শোনান তিনি—বলেন কালে সবই ভাল হবে। চিকিৎসকগণের বিরুদ্ধ অভিমত সত্ত্বেও শ্রীভগবানের এই কথায় আশার সঞ্চার হয় সকলের মনে—সবার মন যে চাইছে নিরন্তর ঐ কথাই শুনতে—কিন্তু হায় তাঁর নিকট দেহের মৃত্যু তো কেবল খোলস পরিত্যাগ মাত্র—তিনি যে চিরন্তন সত্য এবং শাশ্বত—তাঁর দ্ব্যর্থক ভাষার অর্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না ভক্তজনের।

কোন মানুষ কি পারে নির্বিকার হয়ে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে? সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারে কি কেউ নিজের অপরিসীম দৈহিক যন্ত্রণায়? সত্যই কি শ্রীভগবানের দেহানুভূতির বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই?—বিস্ময় প্রকাশ করেন ভক্ত অনুরক্তগণ। শ্রীভগবান বলেন জনৈক আশ্রমবাসীকে—"ওরা এই দেহটাকেই ভগবান

বলে মনে করে আর তার ওপরই আরোপ করে যন্ত্রণাভোগ; যদি মনের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কোথায় যন্ত্রণা ?"

চিকিৎসকগণ ও আশ্রমবাসী সকলেই জানতেন যে তাঁর যন্ত্রণা খুবই বেদনাদায়ক—বিশেষতঃ শেষের দিকে তা সূচীবিদ্ধের ন্যায় কষ্টদায়ক। সবাইকে চিন্তাসঙ্কুল দেখে সান্ত্বনাই দিতেন তিনি—যেন রোগ ভোগ তাদেরই হচ্ছে আর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ—বলেন তাদের—যদি তোমরা মনে কর আমি অসুস্থ তাহলেই আমি অসুস্থ—যদি মনে কর আমি ভাল আছি—তাহলেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয় তাঁর আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল আরো উজ্জ্বল আরো শান্ত জ্যোতির্ময় হয়—করুণা মাখান নয়নযুগল ও সুষমায় ভরা মুখখানি অধিকতর কমনীয় এবং সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে—এত অধিক সৌন্দর্য যা দেখে সময় সময় ভয়ই হয় সবার মনে—বিধিলিপি কি না জানি লিখেছেন অদৃষ্টে!

তৃতীয়বার অস্ত্রোপচার হয় আগষ্ট মাসে—অস্ত্রোপচারের দিন বিকালে চিকিৎসা ভবনের বারান্দায় এসে বসেন তিনি ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দকে দর্শন দানের জন্য—যেন সবই স্বাভাবিক—যেন কিছুই হয়নি তাঁর—এ জগতের কাজ সম্পূর্ণ করেই যাবেন তিনি—স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নিঃশেষ হয়ে আসছেন কিন্তু এটাও খুব আশ্চর্যজনক যে রোগ ভোগের কোন চিহ্নই নেই তাঁব আননে।

গুরুদেবের কঠিন ব্যাধির সংবাদে দেশ বিদেশ হতে আসে ভক্ত ও শিষ্যগণ—সম্ভবতঃ তাঁকে শেষ দর্শনের জন্য—তাঁর চরণে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে। প্রত্যুষে ধ্যানের সময় পরিপূর্ণ সাধনভবন—মৌন ধ্যানে নিমগ্ন সবাই—মহর্ষি অবস্থান করেন প্রশান্ত বদনে সহজ সমাধি অবস্থায়—দেহের এত যে কষ্ট এত যে গ্লানি—মুখে তার চিহ্ন মাত্রও নেই—তাঁর মুখাবয়ব ঘিরে নির্গত হয় জ্যোতিঃ তরঙ্গ—অভিষিক্ত করে তা' উপস্থিতজনকে—মনে হয়

চিন্তার বহু উর্ধে সময়ের গণ্ডীর বাহিরে [illegible] [illegible] অবস্থান করেন তিনি।

যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘট্‌বেই—প্রাক্তন কেউ খণ্ডাতে পারে না—শিষ্য ও ভক্তগণ যাতে তাঁর বিচ্ছেদ কষ্ট সহ্য করতে পারেন—যেন তার জন্যই এই দীর্ঘকাল ধরে বোগভোগ—যেন তার জন্যই এই প্রস্তুতি। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই অনুভব করতেন শ্রীভগবান বিনা তাদেব জীবন নিবর্থক—শ্রীভগবানেব বিচ্ছেদ বেদনা তাবা সহ্য কবতে পারবেন না—তারা হতাশও হতেন এই ভেবে যে শ্রীভগবান স্বইচ্ছায়ই তাদেব পবিত্যাগ করে যাচ্ছেন—প্রকাশ করে বলেই ফেলেন কেউ কেউ তাদেব আশঙ্কাব কথা শ্রীভগবানকে। উত্তবে তিনি বলেন—'কোথায় আর যাব আমি—আমি এখানেই থাকব।'

আগষ্ট মাসেব অস্ত্রোপচাবেব পর উন্নতি হয় বলেই মনে হয়—কিন্তু নভেম্বব মাসে আবার দেখা দেয় সেই টিউমার হাতের উপরি-ভাগে প্রায় কাঁধেব নিকটে। ডিসেম্বব মাসে হয় চতুর্থ এবং শেষ অস্ত্রোপচাব—কিন্তু ক্ষত আর শুকায় না—চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন আবোগ্য লাভের আর কোনই আশা নেই।

১৯৫০ এব ৫ই জানুয়ারী জয়ন্তী উৎসব মহর্ষির ৭০তম জন্ম দিবসে। শোক ছায়ার মধ্যে ভাবাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সমবেত হয়েছেন ভক্ত শিষ্য অনুরক্তজনেরা—সকলেই অনুভব কবেন পার্থিব জীবনে এই তাঁর শেষ জন্মোৎসব। দর্শন দেন তিনি সেদিনের আগত অগণিত ভক্তজনকে—শ্রবণ কবেন সেই গান যা রচনা করেন তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁকে প্রশস্তি করে—পাঠও করেন আগ্রহ-ভরে কোন কোন রচনা। অরুণাচলেশ্বর মন্দিরের হাতী এসে পৌঁছায় সহব হতে—তাঁব সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে শুঁড় দিয়ে তাঁর পদস্পর্শ করে অভিবাদন জানায় তাঁকে—অবোধ প্রাণীর অন্তরে কি সাড়া জাগায় অরুণাচলেশ্বব শিবও যেই শ্রীরমণও সেই?—কে জানে!

ক্রমেই দিন শেষ হয়ে আসে—যখন চিকিৎসকেরা আর কোন ভরসাই দিতে পারেন না তখন উপদেশ চাওয়া হয় মহর্ষির নিকট--উত্তরে বলেন তিনি—"তোমরা কি এতদিন আমার পরামর্শ মত চলেছ? যদি শোন আমার কথা তাহলে এতদিন বরাবর যে কথা আমি বলে এসেছি সেই অনুযায়ী চল—চিকিৎসার কোন প্রয়োজনই নেই—প্রত্যেক বিষয়ে তার নিজস্ব গতিতে কাজ হতে দাও।"

শ্রীভগবান তাঁর দৈনিক কাজ কর্ম ধ্যান ধারণা নিয়মানুযায়ীই করে চলেন যতদিন না শারীরিক কারণে একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়েন। সূর্য্যোদয়ের একঘণ্টা পূর্বে স্নান সমাপন করে এসে বসেন সাধন ভবনে—নিয়মিত চলে দর্শন দান—ডুবে থাকেন সমাধি ধ্যানে। জানুয়ারী মাসের পর আর পারেন না সাধনভবনে এসে বসতে—সাধন ভবনের পূর্ব দিকে আশ্রমের ভিতরের রাস্তার পার্শ্বে নির্মিত হয় মহর্ষির শেষের দিকের অবস্থানের জন্য একটী ছোট ঘর ও তৎসংলগ্ন স্নানের ঘর ও বারান্দা। তাঁর নির্বন্ধাতিশয্যে ঐ বারান্দায় আরাম কেদারায় বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে—এখানে বসেই দর্শন দেন তিনি শিষ্য ও ভক্তজনকে। শারীরিক কষ্ট গ্লানি অক্ষমতা কোন কিছুই দমিত করতে পারে না তাঁর পরমার্থ সাধন ও জীবকল্যাণ ব্রত শেষ ক্ষণ শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত।

ভক্তেরা এসে বসেন রাস্তার অপর পার্শ্বে মহর্ষির ঘরের বিপরীতে অবস্থিত সাধন ভবনের অলিন্দে—দর্শন করেন তাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরম প্রিয় গুরুদেবকে। যখন আর বাহিরে বারান্দায় বসা সম্ভব হয় না—নির্দেশ দেন শ্রীভগবান দর্শনার্থীরা সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর ঘরের খোলা দরজার সামনে দিয়ে যাবেন তাঁকে দর্শন করে। হঠাৎ একদিন অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় তাঁর এবং দর্শনদান বন্ধ করেন চিকিৎসক, কিন্তু একটু সুস্থ হয়ে যখনই জানতে পারেন এ ব্যবস্থা—অসন্তুষ্ট হন আর সেইক্ষণ হতে বহাল করেন তিনি পূর্বতন ব্যবস্থা।

ভক্তেরা আসতে থাকেন আরও অধিক সংখ্যায় দেশ বিদেশ হতে—আশ্রমবাসী ভক্ত শিষ্যগণ তো আছেনই—সাধন ভবনের অলিন্দে নিঃশব্দ মৌনধ্যানে কাটান তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দর্শন করেন একবার শ্রীভগবানের করুণাঘন রূপ মাধুর্য্য—আরও অধিকতররূপে হৃদয়ে অনুভব করেন শ্রীভগবানকে—স্পষ্ট অনুভূত হয় তাঁর করুণারশ্মি—উপলব্ধি আসে অনন্ত অব্যয় ব্রহ্মের।

টিউমার আকারে আরও বর্ধিত হয়—সারা দেহ বিষাক্ত হয়ে ওঠে—ফলে রক্তশূন্যতাও বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসকগণ বলেন তাঁর ভিতরে নিশ্চয়ই অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করেন তিনি কিন্তু বাহিরে তা প্রকাশ করেন না মহর্ষি, কেবল মাত্র ঘুমের ভিতরে তাঁর অস্ফুট কাতরোক্তি শোনা যায়। মাঝে মাঝে মাদ্রাজ থেকে আসতেন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ—মহর্ষি ব্যস্তই হয়ে পড়তেন তাদের অভ্যর্থনার জন্য—বারবার জিজ্ঞাসা করতেন তাদের খাওয়া দাওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা হয়েছে কিনা—তাদের অনুরোধ জানাতেন বিশ্রামের জন্য—যেন তিনিই চিকিৎসক আর তাদেরই পরিচর্যার প্রয়োজন।

এত যে শারীরিক কষ্ট ও গ্লানি কিন্তু এর ভিতরেও মহর্ষির কৌতুক প্রিয় স্বভাব পরিহাস করতে ছাড়েন না—টিউমারের বিষয়ে বলেন—ভদ্রলোক বেড়েই চলেছেন। শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসকগণকে বলেন—দেহ ঠিক এঁটো পাতার মত—পাতার ওপর ভাল ভাল উপাদেয় খাদ্য রাখা হয়—খাওয়ার পরই ফেলে দেওয়া হয় পাতা—তারপর কি আমরা আর চেয়ে দেখি ঐ ফেলে দেওয়া পাতার দিকে? মুটে যেমন তার মোট ফেলার জন্য ব্যগ্র তেমনি জ্ঞানীও তার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করতে চান—পরক্ষণেই তিনি আবার বলেন—জ্ঞানী তার দেহ যাক আর থাক এ সম্পর্কে উদাসীনই থাকেন। অন্য একজন ভক্তকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন—মোক্ষ হচ্ছে—কাল্পনিক দুঃখ কষ্ট হতে মুক্ত হয়ে আনন্দময় অবস্থায় অবস্থান করা—যে অবস্থা সর্ব সময় প্রতি মানবের ভিতরেই বর্তমান।

ভক্ত শিষ্যেরা ধরে বসেন শ্রীভগবানকে—তাদের কল্যাণের জন্য তাঁকে বাঁচতেই হবে—তাঁর অবর্তমানে কি গতি হবে সকলের—তাঁর করুণা ব্যতীত কি করে অগ্রসর হবেন তারা অধ্যাত্মপথে—কার ওপর নির্ভর করবেন তাঁরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে।

উত্তরে বলেন শ্রীভগবান—তোমরা দেহের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ কর। সকলের ধারণা আমার মৃত্যু হবে—কোথায় যাব আমি—আমি এখানেই আছি—আমি চিরন্তন—আমি শাশ্বত।

১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার চিকিৎসকগণ শ্রীভগবানের ফুসফুসের চাপ কমাবার জন্য বিরেচক প্রয়োগের কথা বলেন—কিন্তু শ্রীভগবান অসম্মত হন ঔষধ গ্রহণে—বলেন, দুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন রাত্রে শুশ্রুষাকারীকে তিনি অন্যত্র ধ্যান সাধনা করতে নির্দেশ দিলেন—একাই থাকতে চান তিনি সে রাত্রে এ কথাও জানালেন।

পরদিন ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার চিকিৎসকগণ বুঝতে পারেন সেইদিনই ইহজগতে শ্রীভগবানের শেষ দিন। সকালে সমবেত চিকিৎসক, শুশ্রুষাকারী, আশ্রমবাসী ভক্তজনকে উপদেশ দেন মহর্ষি—দেহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে নিষেধই করেন তিনি—তারপরে জানান তাদের তিনি একাকীই থাকতে চান। দুপুরে যখন একটু জল খাওয়ালেন শুশ্রুষাকারী—তিনি জানতে চাইলেন সময়—আবার পরক্ষণেই বলেন সময়ের প্রশ্ন আর নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় ভক্তেরা এক এক জন করে তাঁর ঘরের খোলা দরজার সামনে দিয়ে অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করে ফিরলেন।

মহর্ষির এ জগতের এই শেষের ক'দিন প্রত্যেক ভক্ত তাঁর নিকট হতে লাভ করলেন অন্তর্ভেদী সোজা সমুজ্বল দৃষ্টি—বিদায়কালে অভিষিক্ত করে যান সবাইকে তিনি তাঁর করুণাধারায়—সেই মুহূর্তে অনুভব করেন সবে নিজ অন্তরতম দেশে চিন্ময় সত্তা।

জনৈক ভক্ত বলেন—শেষের ক'দিন মহর্ষির সান্নিধ্যে বসে পূর্বের ন্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন থাকার সুযোগ ছিল না —তিনি তখন খুবই দুর্বল—সন্তর্পণে প্রবেশ করে তাঁর ঘরে শ্রদ্ধা নিবেদন করি পরিপূর্ণ অন্তরে—চেয়ে দেখেন মহর্ষি তাঁর সমুজ্জ্বল দু'টী চোখ নিবদ্ধ করে—যে চোখ আর ইহজগতে দেখবার সৌভাগ্যের দিন ফুরিয়ে আসে আমার—পৃথিবীকে ধরে রেখেছে যে প্রেম—সেই স্বার্থহীন নির্মল পবিত্র উজ্জ্বল প্রেম অনুপ্রবেশ করে তাঁ' হতে আমার অন্তরে—মনে হয় এই তো একমাত্র সত্য—যে পথে মানুষ হবে অবিনশ্বর।

সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীভগবানকে দর্শনের পর শিষ্য ও ভক্তেরা আর গৃহে ফেরেন না। সূর্য্যাস্তের পর শ্রীভগবান বলেন তাঁকে বসিয়ে দিতে—শুশ্রুষাকারীরা জানত তাঁকে বসানর অর্থ তাঁর দেহের যন্ত্রণা আরও বাড়ান—কিন্তু তিনি সেজন্য তাদের উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করেন।

বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে—ধরে থাকেন একজন শুশ্রুষাকারী, একজন চিকিৎসক অক্সিজেন দিতে চান এই সময় কিন্তু তিনি নিষেধই করেন তাঁকে।

আশ্রমবাসী, বাহিরের ভক্তজন ও চিকিৎসকগণ অবশ্যম্ভাবী শেষ মুহূর্তের কথা চিন্তা করেন যখন তাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মহান্ ঋষি লীন হবেন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মে—একজন ফরাসী ফটো-গ্রাফার ও একজন আমেরিকান সাংবাদিকও আছেন সেই দলে—নিজের কাজ ভুলে তারা শোকে দুঃখে অধীর হয়ে পাদচারণা করছেন —হঠাৎ সামনের অলিন্দে বসে একদল ভক্ত অরুণাচল শিবের স্তুতি গান আরম্ভ করেন। মহর্ষি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন সেই গান—তাঁর চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—মৃদু হাস্য করেন তিনি—তাতে ঝরে পড়ে অবর্ণনীয় স্বর্গীয় সুষমা—চোখের কোন হতে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু—আর একবার জোর নিশ্বাস—আর নেই শ্রীভগবান—দেহ পিঞ্জর হতে মুক্ত হন তিনি--মৃত্যুর কোনই

চিহ্ন নেই—যেন সবই স্বাভাবিক যেন শুধু পরের বার আর নিশ্বাস গ্রহণ করেন না শ্রীভগবান—যেন কেবলমাত্র আশ্রয় পরিত্যাগ করলেন তিনি।

৮টা ৪৭ মিনিট। তার পরের কয়েক মুহূর্ত অভিভূত হয়ে পড়েন সবাই। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেন ফরাসী ফটোগ্রাফার—বলেন তিনি চেয়ে ছিলেন আকাশের দিকে—ঠিক সেই চরম-মুহূর্তে বিরাট এক উল্কা নভোমণ্ডলের এক দিক হতে উত্থিত হয়ে উত্তর পূর্বদিকে অরুণাচল পর্বতশৃঙ্গে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়। পরে জানা যায় বহু দূরের মানুষ এমন কি সুদূর মাদ্রাজেও অনেকেই দেখেছেন সে দৃশ্য।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে সবারই—শোকে দুঃখে হন সবে মুহ্যমান। মহর্ষির বসা অবস্থায় দেহ বাহিরে নিয়ে আসা হয়—সযতনে রাখা হয় দেহ অলিন্দে—স্ত্রী পুরুষ—বালক, বৃদ্ধ, যুবা—শিষ্য ভক্ত সন্নাসী সকলেই একে একে এসে প্রাণভরে দেখেন তাদের অন্তর দেবতাকে শেষবারের মত—শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন তাদের ইষ্ট দেবতার শ্রীচরণে—অন্তরে চির অঙ্কিত করেন সেই ভগবৎ মূর্তি—অনুভব করেন সেখানে তাঁর আত্মিক উপস্থিতি।

সমস্ত রাত্রিই ভক্তেরা থাকেন সাধন ভবনে মৌন ধ্যানে নিমগ্ন—অন্য একদল গেয়ে চলেন মহর্ষির এবং অরুণাচলেশ্বরের স্তুতি গান সারা রাত্রি। খবর ছড়িয়ে পড়ে আগুনের ফুল্‌কির মত তিরুভান্নমালয় সহরে—সমস্ত রাত্রি ধরে সহর ভেঙ্গে আসে অগণিত নরনারী—এত জনসমাগম কিন্তু সবাই মৌন—সবাই নিস্তব্ধ—ঠিক যেমনটী পছন্দ করতেন শ্রীভগবান—মৌনতাই অন্তরের ভাষা—তা বাহ্যিক কথার চেয়ে বেশী শক্তিশালী—কারো মুখে কোন কথা নেই—কোন প্রশ্ন নেই—সবারই অন্তর শ্রীভগবানের নাম রূপ রসে বিভোর। 'অরুণাচল শিব' গাইতে গাইতে আসে শহর হতে অগণিত মানবের শোভাযাত্রা—ধীরে ধীরে প্রতিধ্বনিত

হয় সবারই অন্তরে শ্রীভগবানের কথা—"কোথায় আর যাব আমি ? আমি এখানেই আছি, আমি শাশ্বত।"

পরের দিন সহস্র সহস্র মুমুক্ষু ও মুক্তিকামী মানবের সম্মুখে তাদের অন্তর দেবতা অরুণাচলের মহান ঋষি, তাদের প্রাণপ্রিয় শ্রীভগবানের নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয় মন্দির ও পুরাতন সমাধি ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে।

মহাসমাধির পরে

ভারতের এক নির্জন প্রান্তে—অরুণাচলের মহান ঋষির শেষ বিশ্রাম স্থানের নিকটে—সমবেত হ'ন তাঁর শিষ্য ও ভক্তজন —প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় হয় বেদগান—সেই সঙ্গে গীত হয় তাঁর প্রশস্তি গান ও তাঁরই প্রিয় গান 'অরুণাচলেশ্বর শিব'—সেই গানই যা গেয়েছেন তারা সাধন ভবনে শ্রীভগবানের জীবিতকালে। অনুভব করেন সকলে এখনও আশ্রমের প্রতিস্থানে প্রতি বস্তুতে তাঁর উপস্থিতি—ভক্তেরা এসে বসেন সাধন ভবনে এবং সমাধি স্থানে ধ্যান আরাধনায়—যেমন বসতেন তারা শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে—এখনও অনুভব করেন তাঁর করুণারশ্মি নিজ নিজ অন্তরে —সাধনা হয় সহজ সাধ্য।

সেই ছোট্ট ঘর যেখানে শ্রীভগবান অবস্থান করেছেন তাঁর শেষের কয়দিন—সেখানে প্রবেশ করলেই অনুভূত হয় শ্রীভগবানের উপস্থিতি—তাঁর ব্যবহারের খুঁটিনাটি জিনিষ পত্র রক্ষিত হয়েছে এখানে—লাঠি, কমণ্ডলু, পাখা, বই—এই সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় যেন তিনি এখনও অবস্থান করেন এখানে।

শ্রীভগবানের শিষ্য ও ভক্তগণ আজও অনুভব করেন অন্তরে শ্রীভগবানের উপস্থিতি যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে। তাঁর সমাধিস্থানে বা সাধন ভবনে বসে বিচারের পথে সাধনা সুগম হয়. আজও ঠিক সেরূপ যেমন হ'ত তাঁর

কায়িক সান্নিধ্যে বসে—এমন কি ভক্তেরা বলেন এখন অধিকতর-রূপে প্রবেশ করে তাঁর করুণারশ্মি ভক্তের হৃদয়ে—তাতে মন হয় সহজেই অন্তর্মুখীন—উপলব্ধি হয় চিন্ময়ের—'আমি এখানেই আছি,—একথা যে কত বড় সত্য তা তাঁর শিষ্য ও ভক্তরাই অনুভব করেন অন্তরের অন্তস্তলে।

শ্রীভগবানের জনৈক ভক্ত ডাঃ কৃষ্ণস্বামী হতাশই হয়ে পড়েছিলেন মহর্ষির মহাপ্রয়ানে—দুঃখ করেছিলেন এই বলে যে তাঁর জীবনে অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হওয়ার কোন আশাই আর নেই কিন্তু কিছুকাল পরে তিরুভান্নমালয় হতে ফিরে এসে তিনি বলেন—'এমনকি শ্রীভগবানের জীবিতকালেও হৃদয়ে এত শান্তি ও করুণা অনুভব করিনি যেমন করেছি তাঁর সমাধিস্থানে বসে—তিনিই পরিচালিত করেছেন আমার ভিতবের প্রাণীকে—অনুভব করেছি একত্ব।'

শ্রীভগবানকে যারা চাক্ষুষ দেখেছেন ও তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—পরম সৌভাগ্য তাদের; কিন্তু যারা দেখেন নি তাঁকে, চলেছেন তাঁর নির্দেশিত পথে—জ্ঞান করেছেন তাঁকে ইষ্টদেবতারূপে নিজ অন্তরে—তারাও অনুভব করেন অন্তরে তাঁর কৃপাকরুণা—অধ্যাত্ম পথে হ'ন অগ্রসর—ঠিক যেমনটী হ'ত তাঁর দৈহিক সান্নিধ্যে তাঁব জীবিতকালে।

মিস্ হাউয়েস পলব্রান্টনের পুস্তক পাঠে আকর্ষণ অনুভব করেন মহর্ষির প্রতি—কিন্তু তাঁর জীবিতকালে ভারতে আসার কোন সুযোগই তিনি করতে পারেন না। জীবনে সুযোগ এল যখন তখন আর শ্রীভগবান এ জগতে নেই—দ্বিধাযুক্ত মন নিয়েই এলেন তিনি তিরুভান্নমালয়ে শ্রীরমণাশ্রমে। মহাসমাধিস্থানে এসে বসেই অনুভব করেন হৃদয়ে শ্রীভগবানের উপস্থিতি নিজ অন্তরে—হৃদয় মন পূর্ণ হয় কানায় কানায় তাঁর করুণা মাধুর্যে—প্রার্থনা জানান কায়মনোবাক্যে তাঁর সম্মুখে—"আবার যেন ফিরে আসতে পারি তোমার কাছে—এখানে।"

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে যেতে হয় তাকে নিজ দেশে ইউরোপে পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী। ভারতে আবার ফিরে আসার কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই তার কিন্তু মহর্ষি পূরণ করেন তার প্রার্থনা—অপ্রত্যাশিতভাবে চাকুরী লাভ করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তার।

ডাঃ আচার্য চাকুরী জীবন হতে অবসর গ্রহণের পর ঘুরে বেড়ান নানা তীর্থ স্থানে, সাধু সন্তদের আশ্রমে, গুহায় অধ্যাত্ম পথের সন্ধানে কিন্তু শ্রীরমণাশ্রমে এসেই তার মনে হয়—'এই তো আমার নিজস্ব আবাস এখানেই পাব সিদ্ধি—এখানেই মিলবে ইষ্ট।'

থেকে যান তিনি শ্রীরমণাশ্রমে আশ্রম চিকিৎসকরূপে—কিছুকাল পরে মনে হয় তার একটুও অগ্রসর হচ্ছেন না তিনি অধ্যাত্ম পথে। দিনের পর দিন হতাশা বোধ করেন আচার্য—মনের আকুতি জানান তিনি শ্রীভগবানকে—শেষে একদিন সমাধি-স্থানে নতজানু হয়ে দরবিগলিত ধারায় নিবেদন করেন শ্রীভগবানকে—"ভগবান তুমিই এনেছ আমাকে তোমার সান্নিধ্যে—তুমি ভিন্ন কে দেবে আমাকে সেই ইপ্সিত শান্তি যাতে আমার সমগ্র সত্তা হবে পরিপূর্ণ—ডুবে যাব আমি ভগবানের নাম রূপ রস মাধুর্যে।"

সেই রাত্রে স্বপ্ন দর্শন হয় আচার্যের—দর্শন করেন শ্রীভগবানকে—বসে আছেন তিনি সাধন ভবনে বেদীর ওপরে ঠিক যেমন বসতেন ইহজীবনে—আচার্য নতজানু হয়ে উপবিষ্ট তাঁর সম্মুখে—শ্রীভগবান তার মস্তকে হাত রেখে আশীর্বাদ স্বরূপ বলছেন—ঠিক যেমন বলতেন তিনি অনুরূপ ক্ষেত্রে জীবিতকালে—"কে বল্‌ল তুমি অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হওনি—তুমি নও—আমি জানি তুমি কতদূর অগ্রসর হয়েছ ঐ পথে।" আচার্য্য নিবেদন করেন—"আমি কেন এত ধীরে অগ্রসর হব, আমি যে চাই এই জীবনেই উপলব্ধি লাভ করতে।" উত্তরে সহাস্যে মহর্ষি বলেন—"তাই তোমার প্রারব্ধ।"

এই প্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত বলেন—শ্রীভগবানের তিরোভাবের দিন আসবে বছরের পর বছর—আমিও দেখব কোন এক বছর শেষবারের মত ঐ দিন এই পৃথিবীতে—কিন্তু আমার শেষ মুহূর্তে তিনি থাকবেন আমার সঙ্গে যেমন তাদের সঙ্গে থাকেন যারা তাঁকে বরণ করেছেন ইষ্টাদেবতা রূপে— সমর্পন করেছেন মন প্রাণ ইহকাল পরকাল তাঁর চরণে— পেয়েছেন তাঁর কৃপা করুণা ও আশীর্বাদ—মহর্ষির বাণী সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে অন্তরে—

"যে লাভ করেছে গুরুর আশীর্বাদ—চিরদিনই সে থাকবে গুরুর পক্ষপুটে—কোনদিনই তার বিনাশ নাই।"